এরাও মানুষ

রেনে মারাঁ

অনুবাদক :

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

এরাও মানুষ

রেনে মারাঁ

অনুবাদ :

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব
কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা

এই গ্রন্থটীর নাম মূল ফরাসী ভাষায় ছিল, 'বাতোয়ালা'। বাংলা ভাষায় সেই নামটী পরিবর্ত্তিত ক'রে নতুন নামকরণ করা হলো, 'এরাও মানুষ'।

—অনুবাদক

—বিশ্ব-সাহিত্য গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ—

অনুবাদকের কথা

বিংশ-শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাহিত্যে যে-সব উল্লেখযোগ্য বই লেখা হয়েছে, বিভিন্ন ভাষায় লিখিত হওয়া সত্ত্বেও, আমরা ইংরেজী ভাষার মারফৎ তার অধিকাংশেরই পরিচয় পেয়েছি। বিশেষ করে, উপন্যাস ও ছোট গল্পের ক্ষেত্রে একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

কিন্তু য়ুরোপীয় সাহিত্যের আধুনিক ইতিহাসের যে কোন নিষ্ঠাবান ছাত্র একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, তার মধ্যে এমন কতকগুলি বই আছে, যেগুলি ইংরেজী অনুবাদের সুযোগে বিশ্ব-বিস্তারের সৌভাগ্য অর্জন করেনি। যেকোন কারণেই হোক, এই বইগুলির তেমন প্রচার হয় নি, কোন কোনটার অনুবাদ পর্যন্ত হয় নি। যেমন উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জগৎখ্যাত স্পেনীয় নাট্যকার বেনাভান্তের গ্রন্থাবলী ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে যখন প্রকাশিত হ'ল, তখন দেখা গেল যে, ভারতবর্ষ

সম্বন্ধে তাঁর একখানি নাটিকা সযত্নে সেই গ্রন্থাবলী থেকে বাইরে রাখা হয়েছে। কারণ সেই নাটিকাতে বেনাভান্তে ভারতে ইংরেজ-শাসনের ছদ্ম-কল্যাণের গর্বকে ফাঁস করে দিয়েছিলেন।

এই থেকে বোঝা যায়, কেন তা ইংরেজী-জানা জগতে প্রচার লাভ করে নি। এই অনুবাদ-কার্যের ভার, ইংলণ্ড আর আমেরিকার সাহিত্যিকদের এবং প্রকাশকদের ওপর। এই দুই জাতির রাজনৈতিক ধর্মের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ এবং ধনতান্ত্রিকতা, এবং তার অবিচ্ছেদ অঙ্গস্বরূপ জগতের দুর্বল ও ক্ষুদ্রজাতিদের নিষ্পেষণ ও শোষণ বিশেষভাবে বিজড়িত। শ্বেতাঙ্গজাতিরা ঊনবিংশ-শতাব্দীতে তাদের নব-লব্ধ বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতার দরুণ সমগ্র জগতে নিজেদের সভ্যতাকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে যেন, বিশ্ব-সভ্যতার তারাই হল উদ্ধারকর্তা এবং তার অনিবার্য ফলস্বরূপ তারা জগতের কৃষ্ণকায় অসভ্য জাতিদের উদ্ধার করবার মহৎ ব্রত নিয়ে তাদের রাজ্য দখল করে নেয়। বিজ্ঞানের সংস্পর্শ থেকে অসহায়ভাবে দূরে থাকতে বাধ্য হয়ে এই সব কৃষ্ণাঙ্গজাতি এই পাশ্চাত্য আক্রমণকে প্রতিরোধ করবার কোন শক্তিই পায় নি, তাই এই প্রবলের নির্দেশকে মাথা পেতে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। তার ফলে, এশিয়া ও আফ্রিকা, এই দুই মহাদেশে সেদিন সভ্যতার আত্মবিস্তারের নামের আড়ালে যে বীভৎস মানবতার লাঞ্ছনা সজ্ঞানে সংঘটিত

হয়, তার সম্পূর্ণ ইতিকথা যদি কোনদিন প্রকাশিত হয়, তাহলে সভ্যতা-গর্বী মানুষের গর্ব করবার কিছু থাকবে না।

সৌভাগ্যের বিষয় সেই শ্বেতাঙ্গ জাতির মধ্যেই এমন এক-আধজন লোক মাঝেমধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁদের বিবেকে তাঁদের স্বজাতির দ্বারা অনুষ্ঠিত এই সব অনাচার প্রবলভাবে আঘাত করেছে এবং তার ফলে তাঁরা সেই অনাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। সাহিত্যিকদের মধ্যেও এই ভাবে দু'একজন প্রতিভাশালী লেখক জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁরা এই প্রবলের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে নিজেদের লেখনীকে চালনা করেছেন। তার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের কাছ থেকে তাঁদের কম লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয় নি। স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র এই ধরণের প্রতিভাকে বিশেষ সমাদরে গ্রহণ করতে পারে নি এবং তার কলঙ্ক-কাহিনী যাতে জগতে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্যে তাকে রীতিমত সতর্ক থাকতে হয়েছে। সেইজন্যেই এই জাতীয় বই সাম্রাজ্যবাদী-শাসিত জগতে বিশেষ প্রচারের সুযোগ পায় নি।

'বাতোয়ালা' সেই জাতীয় একখানি ফরাসী উপন্যাস। সাহিত্য হিসাবে এই বইখানি ১৯২১ সালে সেই বৎসরের সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তকরূপে ফরাসী সাহিত্যে স্বনামখ্যাত গোঁকুর পুরস্কার পায়। সম্পূর্ণ এক নতুন ভঙ্গীতে রেনে মারাঁ এই উপন্যাসখানি রচনা করেন। ভাষা ও ভঙ্গীর দিক থেকে ফরাসী গদ্যসাহিত্যে এই

বইখানি একটা নতুন সুর জাগিয়ে তোলে, ফরাসী-ভাষার অপূর্ব নমনীয়তার মধ্যে রেনে মারাঁ এক অপরূপ গদ্যভঙ্গীর সৃষ্টি করেন। অনুবাদে সেই ভঙ্গীটি যথাসাধ্য বাংলা ভাষায় আনবার চেষ্টা করেছি।

উনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত আফ্রিকাকে য়ুরোপের লোকেরা 'ডার্ক কণ্টিনেণ্ট' বলে জানতো। এই অজানা মহাদেশে কাঁচামাল, হীরে আর সোনার সন্ধান পেয়ে য়ুরোপের শক্তিশালী জাতিরা এই মহাদেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নিজেদের মধ্যে এই বিরাট দেশকে ভাগ করে নেয়। ইংরাজ, ফরাসী, ইতালীয়ান, বেলজিয়ান—প্রত্যেক জাতের সভ্য মানুষ আফ্রিকাতে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং সেখানকার নিরক্ষর দরিদ্র কৃষ্ণকায় লোকদের অসহায় নিরস্ত্রতার সুযোগ নিয়ে সেই সব উপনিবেশে সভ্যতার নামে যে শোষণ-শাসনের রাজত্ব সুরু করে, তার সংবাদ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ-শাসিত জগতের সংবাদপত্রে অতি সযত্নে এবং সুকৌশলে চাপা দিয়ে রাখা হতো। যাদের ওপর অবাধে এই অত্যাচার চলতো, এই অত্যাচারের বেদনাকে প্রকাশ করবার মত কোন সুযোগ বা যোগ্য সাহিত্যিক তাদের ছিল না। নীরবে এই নির্মম অত্যাচার, কোন নিষ্ঠুর বিধাতার বিধান রূপে মেনে নেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না।

সৌভাগ্যবশত মানবপ্রেমিক সাহিত্যিকদের দুঃসাহসিকতার ফলে মহাদেশব্যাপী এই বিরাট অনাচারের সঙ্ঘবদ্ধ ষড়যন্ত্রের কথা

ক্রমশ একটু একটু করে জগৎ জানতে পারে। বাতোয়ালা সাহিত্য-জগতে সেই দুঃসাহসিক মানব-প্রেমেরই অন্যতম নিদর্শন। ফরাসী কংগো অঞ্চলে সুসভ্য ফরাসী জাতি সেখানকার নিগ্রোদের জীবন ও সভ্যতার ওপর যে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর অভিযান বিনা বাধায় চালিয়ে এসেছে, বাতোয়ালা তারই বেদনাময় কাহিনী জগতে বিজ্ঞাপিত করে দিয়েছে। ফরাসী থেকে এই গ্রন্থ যখন ইংরাজীতে অনূদিত হয়, তখন প্রকাশক মাত্র দেড় হাজার বই ছাপিয়েছিলেন এবং প্রত্যেক বইটিতে তার ক্রমিক সংখ্যা লেখা ছিল। অর্থাৎ একান্ত মুষ্টিমেয় লোকদের জন্যে এই বই প্রকাশিত হয়।

রেনে মারাঁ, পাশ্চাত্য খৃষ্টান পাদ্রীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নয়, এই নিগ্রোদের জীবন তাদেরই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নিখুঁত বাস্তব-ভাবে চিত্রিত করেন, সেইজন্যে খৃষ্টান শ্লীলতা বা অশ্লীলতা-বোধে এঁর কোন কোন অংশ কটু লেগেছিল। কিন্তু সমসাময়িক মানব-জীবনের স্থায়ী প্রমাণরূপে লেখক সেগুলিকে তাঁর রচনার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছেন এবং অনুবাদকও অনুবাদ-ধর্মের রীতি-অনুযায়ী যথাযথভাবে সেগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে বাধ্য হয়েছেন।

ঘটনাচক্রে, সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গ-জাতিদের কাছে আফ্রিকার নিগ্রোদের মতন আমরাও কৃষ্ণকায় জাতি। তাতে আমাদের কোন ক্ষোভ নেই। শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা আফ্রিকার এই কৃষ্ণকায় নিগ্রো জাতিদের যেভাবে জগতে পরিচিত করাবার চেষ্টা করেছে,

তা থেকে তাদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হয়েছে যে, তারা আফ্রিকার বুনো হিংস্র পশুদের মতনই দ্বিপদ জন্তু বিশেষ। তাদের ধর্ম নেই, ধর্মবোধ নেই, হৃদয় নেই, হৃদয়াবেগ নেই, কোন রসবোধ বা সৌন্দর্য-অনুভূতি নেই, অসভ্য বর্বর ও হিংস্র এক জাতের প্রাণী, যারা শুধু জন্মেছে শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার ভার বইবার জন্যে···প্রাণহীন ক্রীতদাসের জাত। শ্বেতাঙ্গ মনিবেরা তাদের সেইভাবেই দেখেছে, সেইভাবেই ব্যবহার করেছে এবং জগতে তাঁদের সেইভাবেই পরিচয় দিয়েছে। এই আদিম প্রাণবন্ত জাতির মধ্যে প্রকৃতি, হৃদয়, মন ও মস্তিষ্কের যে বিরাট সম্ভাবনা সঞ্চয় করে রেখেছে, একদিন না একদিন তার স্ফুরণ হবেই, কৃষ্ণচর্ম বলে তার আড়ালে মানবীয় সম্ভাবনার কিছু নেই, এই বিরাট মিথ্যা অচিরকালের মধ্যেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। আজ এই মুহূর্তে চির-অজ্ঞাত কালো কাফ্রি আর নিগ্রোদের মধ্যে যে সব প্রতিভা জন্মগ্রহণ করছেন, বিশেষ করে হৃদয়-ধর্মের যেটি সবচেয়ে সূক্ষ্মতম প্রকাশ, সেই সঙ্গীতের মধ্যে, সাহিত্যের মধ্যে যেসব প্রতিভা জেগে উঠছে, জগৎ-প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাঁরা সগৌরবে শ্বেতাঙ্গ সমকক্ষদের সমান কৃতিত্ব অর্জন করছেন, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের ছাড়িয়েও উঠছেন।

বাতোয়ালা সেই অবজ্ঞাত মানব-জাতিরই মানসিক কাহিনী। এই কাহিনী লেখবার জন্যে রেনে মারাঁ পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে বিদায় নিয়ে সুদীর্ঘকাল এই কৃষ্ণকায় জাতিদের মধ্যে তাদেরই

একজন হয়ে বসবাস করেন এবং তাদের দিক থেকে তাদের জীবনকে বুঝতে চেষ্টা করেন। যদিও তাদের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে, তাদের ধর্ম-কর্মের সঙ্গে অন্যান্য সভ্য-জাতিদের প্রভূত পার্থক্য আছে, তবুও একথা স্বীকার করতে হবে যে, সভ্য মানুষদের মতন জীবনকে দেখবার তাদেরও একটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী আছে এবং তাদেরও মধ্যে একটা ন্যায়-অন্যায় বোধ আছে, তাদেরও অন্তর ভালবাসা, ঈর্ষা, স্নেহ-মমতা আর রূপ-লালসায় আমাদেরই মতন সাড়া দেয়। আমাদের সঙ্গে না মিললেও, তাদেরও একটা স্বতন্ত্র নীতি আছে। রেনে মারাঁর বিশেষত্ব হ'ল তাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই তাদের জীবনকে তিনি দেখেছেন এবং আমাদের দেখিয়েছেন ; বাংলা সাহিত্যের সৌখীন প্রোলিটারিয়েট লেখকদের মতন নিজেদের মন-গড়া কল্পনার রঙে তাদের রাঙিয়ে তোলেন নি। সেইজন্যে বাতোয়ালার অনেক বর্ণনা, অনেক কথা, হয়ত আমাদের কাছে কটু লাগতে পারে কিন্তু তা মিথ্যা নয়, এবং সেইখানেই এই উপন্যাসখানির একটা বিশেষ মূল্য আছে। একটা অপরিচিত জাতির মনের নিখুঁত মানচিত্র এই উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই এবং আমরা যেন ভুলে না যাই যে উপন্যাস হলো একান্তভাবে adult মানুষের সাহিত্য।

আশা করি, জগতের এক অবজ্ঞাত জাতির মানসিক চিত্ররূপে এই কাহিনী বাংলার পাঠক-পাঠিকাদের মানব-জীবনের বহুমুখী

বিচিত্র রহস্য-ধারার সঙ্গেই পরিচিত করিয়ে দেবে। যুগ-যুগান্তের বিচ্ছিন্নতার বাধা উল্লঙ্ঘন করে অন্ধকার মহাদেশে কৃষ্ণকায় জাতিরা জেগে উঠছে, তাদের কৃষ্ণচর্মের অন্তরালে যে আদিম প্রাণ-শক্তির ধারা অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, বিংশ শতাব্দীর সংস্পর্শে তা নবশক্তিতে, নব সম্ভাবনায় জেগে উঠছে। মানব-সভ্যতার অনাগত বিশ্বৈক-সম্ভাবনা তাদেরও দানে পরিপুষ্ট হবে…

অন্ধকার তামসী রাত্রির মধ্যে জ্বলে উঠবে বিশ্ব দেয়ালী…
বাতোয়ালার মতন গ্রন্থ সেই মহা-সম্ভাবনারই অগ্রদূত।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঘরের ভেতর যে আগুনের কুণ্ড জ্বালা হয়, সারারাত্রি ধ'রে জ্বলে জ্বলে তা নিভে এসেছে এখন। পড়ে আছে শুধু স্তূপাকার অর্দ্ধদগ্ধ কাঠ-কয়লা, আর ভস্ম, তখনও গরম। ভেতরকার মেটে গোল দেয়াল গরমে ঘেমে উঠেছে। সামনের গর্তের ভেতর দিয়ে একফালি অস্পষ্ট আলো এসে পড়েছে। সেই গর্তই হ'ল ঘরের দরজা। খড়ো চালের ভেতর থেকে অনবরত উঠছে একটা খস্ খস্ শব্দ······উইপোকার চলাফেরার শব্দ।

বাইরে ডেকে ওঠে মুরগীগুলো। তাদের কিরিকিরি-আওয়াজের সঙ্গে মিশে যায় ছাগল-ছানাদের ডাক···ঘুম ভেঙ্গে তারা তাদের মায়েদের খুঁজছে। ক্রমশ ডাকতে সুরু করে দেয় লম্বা-ঠুঁটো পাখীগুলো···। তাদের মিলিত কলরবের পেছনে, পাম্বা আর বাম্বার তীরে ঘন সবুজ বন থেকে আসে বাকাউয়ার কর্কশ চীৎকার···আফ্রিকার বুনো বাঁদর, কুকুরের মতন মুখের চোয়াল।

এই অঞ্চলের প্রধান বাতোয়ালা, তখনও ঘুমের নেশায় আচ্ছন্ন বিছানায় শুয়ে আছে···শেষ ঘুমের ভেতর থেকে স্পষ্ট

শুনতে পায় এই সব পরিচিত আওয়াজ। আশে-পাশে পাঁচখানা গাঁয়ের সে 'মুকুন্দজী', মোড়ল।

বিছানায় শুয়েই সে হাই তোলে, এ-পাশ ও-পাশ পাশ-মোড়া দেয়, হাত-পাগুলো টেনে ঠিক করে নেয় ; ভেবে ঠিক করে উঠতে পারে না, বিছানা ছেড়ে উঠে পড়বে, না আবার আর এক পাল্‌টা ঘুমিয়ে নেবে।

ওঠো, জাগো নাকৌরা ! কিন্তু কেনই বা উঠতে হবে ? সে ভাবতেও চায় না···সোজাই হোক্ আর জটিলই হোক্, ভাবনা-চিন্তার ধার সে ধারে না।

হাঁ, উঠতে তো হবেই কিন্তু ওঠা বল্লেই তো ওঠা হয় না। তার জন্যে রীতিমত খানিকটা মেহনৎ তো করতে হবে ! অনেক-খানি চেষ্টা। উঠতে হবে, শুনতে খুব সোজাই মনে হয়। কিন্তু তাকে কাজে পরিণত করা রীতিমত একটা কঠিন ব্যাপার... কেননা, সে জানে, আজ তার কাছে জেগে ওঠা মানেই হলো কাজ করা...অন্তত শাদা-চামড়ার লোকগুলো সেই কথাই তাদের শিখিয়েছে।

কাজ করতে তার যে বিরক্ত লাগতো কোনদিন, তা নয়। পরিশ্রম করবার মতই তার শক্ত দেহ, নিরেট, নিটোল ; লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ সব পেশী ; তার মতন হাঁটতে, ছুরি চালাতে, কুস্তি করতে খুব কম লোকই পারে।

বাণ্ডাদের সেই বিরাট দেশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত

পর্যন্ত লোকের মুখে মুখে তার অদ্ভুত শক্তির আশ্চর্য সব কাহিনী রূপকথার গল্পের মতন ইতিমধ্যেই ঘুরে বেড়ায়। নারীদের হৃদয়-জয়ে কিম্বা শত্রুদের দুর্গ-জয়ে, কিম্বা অরণ্যে বুনো জন্তুদের শিকারে তার অসংখ্য কীর্তির কথা ইতিমধ্যেই তার স্বজাতির মনে একটা বিস্ময়ের স্বর্গ-লোক রচনা করেছে। যখন রাত্রিতে বনের মাথার ওপর আইপেন্ (চাঁদ) ভাসতে ভাসতে এসে পৌঁছয়, দূর-দূরান্তের সব গ্রামে, ম্‌বিস, ডাক্‌পা, ডাকানো আর লাংবাসীরা তাদের এই সেরা 'মুকুন্দজী' বাতোয়ালীর কীর্তির গান গেয়ে ওঠে, গানের সঙ্গে সঙ্গে বাজতে থাকে তাদের হাতের যন্ত্র, বালাফু আর কুন্দে, সঙ্গে তাল দিয়ে চলে তাদের তবলা লিউঘা।

সুতরাং কাজ করতে তার কোন ভয় ছিল না।

কিন্তু কথা হলো, শাদা লোকগুলোর ভাষায় এই কাজ কথাটার একটা আলাদা মানে ছিল। আশ্চর্য অদ্ভুত মানে। তাদের ভাষায় কাজ হলো অকারণ ক্লান্তি, উদ্দেশ্যহীন একটা অবসাদ...কাজ মানে হলো অশান্তি, যন্ত্রণা, বেদনা, স্বাস্থ্যক্ষয়, একটা কাল্পনিক লক্ষ্যের পেছনে অকারণে ছুটে চলা।

উঃ! ঐ শাদা লোকগুলো! কেন তারা, তারা সকলে তাদের নিজের দেশে যে-যার ঘরে ফিরে যায় না? কেন তারা তাদের নিজের ঘর-গেরস্থালির ব্যাপার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না? কেন তারা তাদের নিজেদের জমি-জমার চাষ-বাস নিয়েই থাকে

না ? তার বদলে কেন তারা অকারণ অপ্রয়োজনীয় কতকগুলো টাকা রোজগারের জন্যে হন্নে হয়ে ঘুরে বেড়ায় ?

এতটুকুতো হলো জীবনের মেয়াদ। যারা এই সত্য না বুঝেছে তারাই অমনিধারা কাজ ক'রে তা অকারণ ক্ষয় ক'রে বেড়ায়। যে মানুষের দৃষ্টি ঘোলাটে নয়, সে জানে কাজ-না-করার মধ্যে কোন গ্লানি নেই। কাজ-না-করা মানে তো অলসতা নয়। বাতোয়ালা স্থির নিশ্চিতভাবে জানে, কিছু-না-করা মানেই হলো যা' কিছু পেয়েছ স্বাভাবিকভাবে তোমার চারদিকে, তাকেই সুন্দরভাবে উপভোগ করা, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। তার এ সিদ্ধান্ত যে ভুল, তা আজও কেউ তাকে প্রমাণ করে দিতে পারে নি। প্রত্যেকটা দিন আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। যেদিন চলে গেল তার কথা ভাববার কোন দরকার নেই, যেদিন রাত প্রভাতে আসছে তার জন্যে দুশ্চিন্তা করবারও কোন প্রয়োজন নেই। ভাবনা-চিন্তাহীন স্বচ্ছ নিরুদ্বেগ প্রতিদিন বেঁচে থাকা, এই তো চরম বেঁচে থাকা !

তাছাড়া, বিছানা ছেড়ে ওঠে কি হবে ? দাঁড়ানোর চেয়ে বসে থাকা ঢের ভাল, বসে থাকার চেয়ে শুয়ে থাকা ঢের বেশী আরামের। এ তো অতি সোজা কথা···সবাই জানে।

যে মাদুরটার ওপর সে শুয়ে ছিল, তা থেকে শুকনো লতার একটা সুবাস ওঠে। চমৎকার মসৃণ...সদ্য-নিহত কোন ষাঁড়ের চামড়া এত নরম আর মসৃণ হতে পারে না।

সুতরাং চোখ বন্ধ ক'রে না ঝিমিয়ে, সে তো আর একবার ঘুমোতে পারে! বেশ ভাল করে আর একবার পরখ করে দেখতে পারে যে 'বোগ্‌বো'র (মাদুর) ওপর শুয়ে আছে, সত্যি সেটা কতখানি মসৃণ...

তাহ'লে, আগুনটাকে আবার জ্বালিয়ে তুলতে হয়।

গোটাকতক শুক্‌নো গাছের ডাল আর একমুঠো খড়, তাতেই হবে। মুখ ফুলিয়ে সে নিভন্ত আগুনে জোর করে ফুঁ দেয়। তখনও ছাই-এর ভেতরে ভেতরে আগুনের কণা লুকিয়ে ছিল। দেখতে দেখতে কাটফাটার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গোলাকারে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে থাকে। দম-বন্ধ-করা তীব্র ধোঁয়া। নিভে-যাওয়া আগুনের ভেতর থেকে লক্ লক্ করে জ্বলে ওঠে শিখা...তৈরী হয়ে গিয়েছে আগুন।

আগুনের দিকে পিঠ করে, সেই মিষ্টি আঁচের আমেজে সে আবার ঘুমোতে চেষ্টা করে। বনের মধ্যে ইগুয়ানা যেমন নির্ভাবনায় রোদ পোয়ায়, তেমনি নির্ভাবনায় উপভোগ করা এই মধুর উত্তাপ। তার ইয়াসী...অর্থাৎ তার স্ত্রী···যা করছে, তাই অনুসরণ করা ছাড়া আপাতত আর কি করবার আছে?

অনেকদিন হলো এই ইয়াসীর সঙ্গে সে ঘর করছে। শান্ত, নগ্ন নিরুদ্বেগ সে এক পাশে ঘুমিয়ে আছে। একটা কাঠের ওপর মাথা, দুটো হাত পেটের ওপর, পা দুটো ঈষৎ ফাঁক করা,

নিরুদ্বেগে নাক ডাকিয়ে চলেছে। পাশেই একটা উন্নুন, তারই মতন তারও নিভে গিয়েছে আগুন।

কি চমৎকার সুখেই না সে ঘুমুচ্ছে! ঘুমের মধ্যে কখনো কখনো পেট থেকে হাত তুলে স্তনের ওপর রাখছে...ভেঙ্গে-পড়া, শীর্ণ স্তন, শুকনো তামাক-পাতার মতন। কখনো বা ঘুমের মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলার সঙ্গে গা-টা একটু চুলকে নিচ্ছে। ঠোঁট দুটো হঠাৎ নড়ে ওঠে এক-একবার। গা এলিয়ে দেয়। তারপর আবার স! স্থির হয়ে আসে, আবার নাক ডাকতে থাকে।

ঘরের এক ধারে একটা গর্ত্তের ভেতর কতকগুলো রবারের চুবড়ী জমা হয়ে পড়ে আছে। তার ওপর বসে ঝিমোচ্ছে জুমা, ছাই-রঙা তার কুকুরটা...বিষণ্ণ ম্লান মুখ।

উপবাস-শীর্ণ তার ছোট্ট দেহের মধ্যে চোখে পড়ে শুধু তার লম্বা খাড়া ছুঁচালো কান দুটো, যেন তার ঘুমন্ত দেহের মধ্যে সব সময় সেই দুটো কানই জেগে আছে। হয়ত গায়ে মাছি উড়ে এসে বসলো কিম্বা কোন পোকা কামড়ালো, দেহটা ঝাড়া দিয়ে উৎপাতটাকে দূর করতে চেষ্টা করে। চোখ চেয়ে একবার দেখে নেয়, কাছেই তার মনিবাণী ইয়াসীগুইন্দজা শুয়ে আছে,তার মনিবের সবচেয়ে প্রিয় ইয়াসী, মনিবাণী যখন ঘুমুচ্ছে, তখন সে আর উঠবে কেন? সেইখানেই শুয়ে থাকে, নড়ে না একটুও। কখন বা, স্বপ্নের নিষ্ঠুর পরিহাসে বিচলিত হয়ে শূন্যে মুখ তুলে চীৎকার করতে থাকে···ঘরের নীরবতা আহত হয়ে ওঠে।

বাতোয়ালা কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে ভঙ্গী-পরিবর্তন করে নেয়। সত্যি, চেষ্টা করে ঘুমানো অসম্ভব! তার বিশ্রাম করার বিরুদ্ধে সবাই যেন আজ ষড়যন্ত্র করেছে। কুঁড়ে ঘরের ফাঁক দিয়ে বাইরে থেকে ভোরের কুয়াশা ঢুকছে। সব ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। তাছাড়া, তার ক্ষিদেও পেয়েছে। হায়! দিন এসে গিয়েছে।

তাছাড়া, এখন কি রকম করেই বা ঘুমাবে? বাইরে ঠাণ্ডায়, ভিজে ঘাসের বনে গেছো-ব্যাঙ আর ষাঁড়-ব্যাঙ স-পরিবারে পাল্লা দিয়ে চীৎকার সুরু করেছে। ভেতরে কুয়াশার হিম, তায় মরে-যাওয়া আগুনে তেমন করে আর আঁচ ওঠে না, তাই মশার দল নির্ভাবনায় আবার সশব্দে ঘুরতে থাকে। ছাগল-ছানাগুলো আপনা থেকে যদিও বেরিয়ে গিয়েছে, কিন্তু মুরগীগুলো তখনো রয়েছে, তুমুল সোরগোল তুলেছে।

এমন কি হাঁসগুলো, স্বভাবতই যারা শান্তশিষ্ট থাকে, ঘুম থেকে উঠে দলপতিকে ঘিরে তারাও কলরব জুড়ে দিয়েছে। কখনো গলাটা বাড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, কখনো বা সোজা করে তুলে, বিস্ময়ে চারদিকে কিসের যেন সন্ধান করে বেড়ায়।

তাদের ভঙ্গী দেখলে, স্পষ্ট মনে হয়, যেন তারা এক বিরাট ধাঁধায় পড়ে গিয়েছে। তাদেয় হংস জীবনে যেন এক অভূতপূর্ব নতুন সমস্যার সামনে তারা এসে দাঁড়িয়েছে। ল্যাজ নেড়ে

এ-ওকে জিজ্ঞাসা করে, ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে ফিরে আলোচনা করে···যেন একটা মীমাংসায় আসবার জন্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ সেইভাবে ঘুরে ফিরে আলোচনা করার ফলে যেন তারা সমস্যার সমাধান খুঁজে পায়। তাদের আলোচ্য লক্ষ্যকে যেন সামনে দেখতে পায়, তখন গম্ভীর ভারিক্কি চালে সারি বেঁধে, সেই রবারের ঝুড়িগুলোর চারদিকে ঘুরতে থাকে। ঘরের এককোণে গিয়ে আবার সভা করে বসে। মাঝে মাঝে ঘাড় তুলে দরজার দিকে চেয়ে দেখে।

হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন সিদ্ধান্ত ঠিক করে ফেলে। গম্ভীরভাবে গুণে গুণে পা ফেলে ঈষৎ-আলোকিত দরজার দিকে অগ্রসর হয়। লাফাবার জন্যে মাটীতে কয়েকবার ডানার ঝাপট দিয়ে নিজেকে ঠিক করে নেয়···তারপর···ডানা মেলে লাফিয়ে ওঠে···বাইরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

তার দেখাদেখি অন্য সবাই সেই একই পন্থা অনুসরণ করে।

এতক্ষণে জুমার ঘুম যেন ভাঙ্গে। অবশ্য হাঁসেদের এই গোলমালে তার ঘুম ভাঙ্গে নি। এ গোলমাল তার অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল!

যখন তার মা বেঁচেছিল, অর্থাৎ তার মনিবরা তার মাকে খেয়ে ফেলার আগের দিনে, তখন থেকেই রোজ সকালে এই রকম গোলমাল সে শুনে আসছে।

মানুষ আর পশু এখানে বাধ্য হয়েই এক ছাদের তলায় একসঙ্গে বাস করে। তাই একসঙ্গে থাকতে থাকতে পরস্পর পরস্পরকে সহ্য করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

তবে, প্রথম প্রথম জুমার জীবনটাকে বড়ই কষ্টকর মনে হতো। কুকুর হিসেবে তার কি কি কর্তব্য, তা তখনও ঠিক সে আয়ত্ত করে উঠতে পারে নি। মনিবের পায়ের দিকে লক্ষ্য রেখে সময় বুঝে ডেকে উঠতে তার মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যেতো।

বাতোয়ালার অনেক নিষ্ঠুরতা আর ইয়াসীগুইন্দজার অনেক ধমকানি তাকে সহ্য করে বড় হতে হয়েছে। তার ওপর ছিল ছাগল-ছানাগুলোর হরেক-রকম নষ্টামি আর হাঁসগুলোর ঔদ্ধত্য, তাকে মাঝে মধ্যে পাগল করে তুলতো।

তার ফলে, একটুতেই তার মেজাজ বিগড়ে যেতো। কাজ করতে ডাকলেই সে বিরক্ত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে উঠতো এবং সঙ্গে সঙ্গেই পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করতো। লাথির ভয়ে তার মগজ এমন ধারালো হয়ে উঠেছিল যে, সাদা চামড়ার লোক দেখলেই সে ছুটতে আরম্ভ করে দিতো।

সুতরাং তার ঘুম যদি ভেঙ্গে থাকে, তা গোলমালের জন্যে নয়। খুব বেশী ঘুমিয়েছে বলেও নয়। ঘুম অফুরন্ত। এ বিষয়ে তার মনিবের সঙ্গে সে একমত। ঘুমিয়ে কেউ ক্লান্ত হয় না।

সে ঘুম থেকে উঠলো কারণ উঠতে তো হবেই।

জেগে-ওঠা তার পক্ষে কিন্তু খুব একটা আনন্দের বিষয়ও

নয়। তার জীবনের অভিজ্ঞতায় সে বুঝেছে, বাতোয়ালার কাছে, বাতোয়ালা কেন প্রত্যেক মানুষের কাছেই, একটা কুকুরের জীবনের কি দামই বা আছে ?

মারতে মারতে তাকে তারা মেরেই ফেলে, ক্ষিদে পেলে খেয়ে ফেলে, বিরক্ত হলে কান কেটে ছেড়ে দেয়। এইতো কুকুরের জীবন! তার বদলে কুকুর কি বা করতে পারে? কুকুর করেই বা কি ? একরকম নিষ্প্রয়োজন বল্লেই হয়।অবিশ্যি যখন বনে আগুন লাগে, তখন কুকুরের খানিকটা দরকার হয়। হাতের কাছ থেকে শীকার যখন পালিয়ে যায়, তখন তার পিছু তাড়া করবার জন্যে দরকার হয়। তা ছাড়া কুকুরের আর কি দরকার ? নিষ্প্রয়োজন।

বহুদিন হলো জুমা মানুষকে পুরোপুরি চিনে নিয়েছে। তাদের সব রকম-সকম তার জানা হয়ে গিয়েছে। অনেকদিন হলো সে বুঝতে পেরেছে, ঘরে বসে ঘুমুলে, কেউ তার মুখে খাবার এনে দেবে না।

সুতরাং তাকে জাগতে হয়। সে জানে এই ভোরবেলা বেরিয়ে পড়লে টাটকা ছাগল-নাদি পাওয়া যায়। ভোর-বেলাকার এই নাদিতে তবুও খানিকটা দুধ-দুধ গন্ধ থাকে। যে কুকুরের ভাগ্যে সারাদিনের মধ্যে চিবোতে আর কিছু জুটবে না, তার কাছে এই ভোরের ছাগল-নাদিই পরম উপাদেয় খাদ্য।

ছাগলের পরিত্যক্ত এই পদার্থ, তাও সংগ্রহ করতে হলে

নিশ্চিন্তে বসে থাকা যায় না। সেই ছাগল-নাদির আবার ভাগীদার আছে, গোবুরে-পোকার দল। এত ঠাণ্ডায় কি তারা বেরিয়েছে? বোধহয় না। হঠাৎ কিসের আশায় জুমার বিষণ্ণ মুখে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটে ওঠে। হয়ত ভোরবেলায় ঘুরতে ঘুরতে একটা-আধটা মুরগীর ডিমও জুটে যেতে পারে। না, না, এত আশা করা ঠিক নয়…

জুমা উঠে বসে। জিভ দিয়ে পেট আর পায়ের চেটো ভাল করে চুষে, চেটে নেয়। তারপর ক্লান্ত শীর্ণ দেহ নিয়ে কোন রকমে হেলতে দুলতে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়!

এতদিনের অভিজ্ঞতায় সে শিখেছে কি করে মনের ভাব লুকিয়ে চলতে হয়। তাই দরজার কাছে এমন ভঙ্গী করে দাঁড়ায় যেন সীমাহীন ক্লান্তির অসহ্য জড়তা তাকে পেয়ে বসেছে। যদি সে একটু স্ফূর্তির আমেজ দেখায়, তাহলে এক্ষুণি হয়তো বাতোয়ালা তার পিছু নেবে। তখন কোন কিছু যোগাড়ের আর কোন আশা-ভরসাই থাকবে না। সেটি হলে চলবে না।

বাতোয়ালাও ভাবছিল। একে একে হাঁসগুলো, ছাগল-ছানারা, মুরগীগুলো, সবশেষে জুমাও বেরিয়ে চলে গেল। তাদের অনুসরণ করাই তার উচিত। তা ছাড়া, লিঙ্গচ্ছেদের উৎসব সামনে রয়েছে। এখনো পর্যন্ত কাউকে নেমন্তন্ন করা হয় নি। আর সময় নেই, তাড়াতাড়ি সেটা সেরে ফেলতে হবে।

দুচোখ রগড়ে, একবার ভাল করে নাকটা ঝেড়ে নিয়ে উঠে বসলো, গা চুলকোতে লাগলো। বগল, উরু, মাথার পশ্চাদদেশ, হাত, কোন অঙ্গই বাদ দিল না। চুলকোনো যে রীতিমত একটা ব্যায়াম। চুলকোনোর ফলেই না শিরায় রক্ত চলাচল আবার দ্রুত হয়। চুল্‌কোতে অবশ্য এক সময় রীতিমত ভালও লাগতো, আজ শুধু অভ্যাস, ঘুম থেকে জেগে ওঠার লক্ষণ।

আরে, চারিদিকে একটু চেয়ে দেখলেই তো বোঝা যায়! কোন্ প্রাণী ঘুম থেকে উঠে গা চুলকোয় না? সব প্রাণীই তা করে। মানুষ হয়ে তা অনুকরণ করতে দোষ কি? এটা তো একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। যে দেখবে ঘুম থেকে উঠে গা চুলকোচ্ছে না, বুঝবে তার ঘুম এখনও ভাল করে ছাড়ে নি।

তবে চুলকোনো ভাল বটে কিন্তু হাই তোলা আরো ভাল। হাই তোলা মানে হলো, মুখ দিয়ে ভেতরের ঘুমকে পুরোপুরি বার করে দেওয়া!

এবং সেটা যে সম্ভব তা প্রকৃতির দিকে চাইলে অনায়াসেই বোঝা যায়। শীতের দিনে কে না দেখেছে, দেহের ভেতর থেকে একরকম ধোঁয়া বেরোয়? এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ঘুমটা হলো দেহের ভেতরের একটা গোপন আগুন। এই আগুনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে একেবারে অভ্রান্ত। তা ছাড়া, ওঝারা হলো সবজান্তা, তাদের কোন ভুলই হতে পারে না। তার বাবার কাছ থেকে এই ওঝাগিরি সে শিখেছে, তার বাবার

সব যাদুবিদ্যা সে পেয়েছে। তাইতে তো আজ সে পাঁচখানা গাঁয়ের বাতোয়ালা, সর্দার।

তা ছাড়া, একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে,—ঘুম যদি ভেতরকার আগুন না হয়, তা হলে নিঃশ্বাসের সঙ্গে ধোঁয়া বেরোয় কি করে? আগুন ছাড়া ধোঁয়া কি কেউ দেখেছে? এ নিয়ে সে যে-কোন লোকের সঙ্গে তর্ক করতে প্রস্তুত···

তা ছাড়া, প্রথা বলে একটা কথা আছে। পুরানো প্রথা হলো অভ্রান্ত সত্য। বহু দিনের বহু অভিজ্ঞতায় তাদের জন্ম হয়েছে।

বাতোয়ালা আধ-শোয়া অবস্থায় ভাবে। সে হলো আশে-পাশের গাঁয়ের, এতগুলো লোকের বাতোয়ালা, অর্থাৎ তাদের সমস্ত প্রথার সেই হলো রক্ষক। তার নিজের জাতের সম্পদ সে যা পেয়েছে, সারা জীবন ধরে তাকেই সে আগলে ধরে আছে। সেই তার কর্তব্য।

তার চেয়ে গভীর সে কিছু ভাবতে চায় না। তার কোন দরকারই নেই। প্রথাতে যা প্রতিষ্ঠিত, কোন তর্ক তাকে হটাতে পারে না। অসম্ভব।

তা না হয় হলো, কিন্তু লিঙ্গচ্ছেদ-উৎসব কোথায় কখন হবে, তাতো বন্ধু-বান্ধবদের আগে থাকতে জানাতে হবে। আপাতত নিভন্ত আগুনটা ঠিক করে নেওয়া দরকার। তার আগুন

তাকেই ঠিক করে নিতে হবে। মানুষ যে-যার একলার জন্যেই। অন্তত সেই তত্ত্বই সে শিখেছে।

আগুন ঠিক করে, সে বেরিয়ে পড়লো।

অল্পক্ষণ পরেই আবার ফিরে এলো। গ্রীষ্মই হোক আর বর্ষাই হোক, সামান্য একটা কোমর-বন্ধ ছাড়া আর কিছু সে পরতো না। সেই জন্যে শীতের দিনে শীতের কামড় একটু-আধটু সহ্য করতে হতো।

বাইরের কুয়াশা ঘন হয়ে পড়ছে। এত ঘন যে ঠাওর করে উঠতে পারে না, তার বাকি আটজন স্ত্রীর কুঁড়েঘর ঠিক কোন্ দিকে।

উহু···হ্···হ্···হিমে দেহ কাঁপতে থাকে···দাঁতে দাঁত লেগে যায়।

ঘরে ঢুকে তৈরী আগুনে ফুঁ দেয়। আগুনের আঁচে হিমের জড়তা কেটে যায়। আগুনের ওপর হাতের পাতা মেলে দিয়ে আপনার মনে একটা পুরানো গানের সুর গুণ গুণ করে গেয়ে ওঠে। গুণ গুণ করতে করতে গানের ভাষায় নতুন শব্দ যোজনা করে। কান পেতে শুনলে বোঝা যাবে, তার মধ্যে শাদা-চামড়াওয়ালা মেয়ে-পুরুষদের কথাও আছে।

বাইরে হাল্কা হাওয়া জেগে ওঠে। ভিজে পাতার মধ্যে মৃদু শিহরণ জাগে। ডালগুলো দুলে দুলে এ-ওর ঘাড়ে গিয়ে পড়ে। বাঁশের উঁচু মাথা নুয়ে প'ড়ে দুলতে থাকে। করুণ

দীর্ঘশ্বাসের মতন তাদের বুক থেকে একটা আওয়াজ ওঠে।

বাতাস ক্রমশ জোরে বইতে থাকে। ঘন কুয়াশা টুকরো টুকরো হয়ে যায়। অবশেষে একটা দমকা হাওয়া এসে তাদের দূরে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। মেঘের ভেতর থেকে স্পষ্ট স্বচ্ছ সূর্য ফুটে ওঠে!

বাতোয়ালা তার কুঁড়ে ঘরের বাইরে, নতুন-জ্বালা অগ্নিকুণ্ডের সামনে এসে বসে। উদাসীন শূন্য মনে সে তার পুরানো গড়গড়াতে তামাক দিয়ে ধীরে ধীরে টানতে আরম্ভ করে···

বাইরে এসে গিয়েছে দিন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আধ-বোঁজা চোখে বাতোয়ালা ধূমপান করে চলে। আরামে ছোট ছোট করে টান দেয়, ছোট ছোট ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঘুরতে ঘুরতে বাতাসে মিলিয়ে যায়।

অনেকক্ষণ কেটে যায় এইভাবে।

ক্রমশ আকাশে সূর্য প্রখর হ'য়ে উঠতে থাকে। বাড়তে থাকে রোদের তেজ। মন্দ লাগে না। প্রতিদিনের অভ্যাসে সয়ে গিয়েছে রোদের ঝাঁঝ। গায়েই লাগে না।

সামনে তুলোর গাছে মাঝে মাঝে হঠাৎ দমকা হাওয়ায় আলোড়ন জাগে। নরম কচি ডালের কাঁচা সবুজ পাতা শির শির করে ওঠে।

কোন কোন গাছের ছাল ভেতর থেকে চিড় খেয়ে শুকিয়ে দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছে ; আর তার ভেতর থেকে ফেটে পড়ছে প্রাণ-রস, জমাট-বাঁধা রক্ত অশ্রু-বিন্দুর মত।

একগাছ থেকে আর এক গাছে সেতু রচনা করে, ঠাস-বুনোনি জালের মতন প্রত্যেক গাছকে জড়িয়ে উঠেছে বিচিত্র সব লতা।

তপ্ত মাটীর শুকনো গন্ধের সঙ্গে, বুনো ঘাস আর পচা জলার ঝাঁঝালো দুর্গন্ধ মিশে বাতাসকে ভারী করে তোলে। তার ভেতর থেকে নাকে আসে বুনো সব্জীর রোদে-পোড়া গন্ধ।

চারিদিকের এই ঘন সবুজের ভেতর আত্মগোপন ক'রে আনন্দে ডাকতে থাকে বুনো পাখীর দল। স্বচ্ছ নীল আকাশে ভ্রাম্যমান কৃষ্ণ-বিন্দুর মতন ঘুরে বেড়ায় শব-সন্ধানী শকুনির দল···দূর থেকে মাঝে মাঝে বাতাসে ভেসে আসে তাদের বীভৎস চীৎকার। ক্ষীণ অথচ কর্কশ।

পোম্বা কিম্বা বাম্বার তীর থেকে ভেসে আসে টুকরো টুকরো গানের সুর···কারা যেন গাইছে, "এ হে···ইয়াবা···হো"···

তার অর্থ হলো, নদীর ধারে, যে কোন জায়গায় হোক, সুরু হয়ে গিয়েছে কাজ···গানের সুর জুগিয়ে চলেছে মেহনতের ছন্দ।

রোদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে থেমে আসে সব শব্দ। সে শব্দ-হীনতার একাধিপত্য ভঙ্গ করে শুধু জেগে ওঠে সেই নদী-পারের একঘেয়ে সুর। হঠাৎ গান যখন থেমে যায়, কান পেতে স্পষ্ট

শোনা যায়, চারিদিকে তপ্ত রোদের ঝাঁঝে ফেটে পড়ছে গাছের গা···শোনা যায়, সেই সব ক্ষীণতম শব্দ, যা দিয়ে তৈরী হয় মধ্যাহ্নের নীরবতা।

আবার ভেসে আসে সেই সুর···এবার যেন ক্ষীণতর।

এতক্ষণে ইয়াসীগুইন্দজা যথারীতি রান্না করেছে কাসাভা-দানার ভাত...সেই সঙ্গে হয়েছে তরকারি, আলু-সিদ্ধ, আর বুনো শাক।

বাতোয়ালা খেতে বসে, ইয়াসীগুইন্দজা স্বামীর পরিত্যক্ত হুঁকোটি তুলে নেয়···তামাক টানতে টানতে অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে থাকে উনুনের হাঁড়ির দিকে, সেখানে গুটি-পোকার ষ্টু তৈরী হতে থাকে নরম আঁচে।

তার আটজন সপত্নী-সখী তখন যে-যার কুঁড়ে ঘরের বাইরে নগ্নাবস্থায় দরমার বেড়ায় ঠেস দিয়ে প্রসাধনে ব্যস্ত।

এর মধ্যে লজ্জা বা সঙ্কোচের কিছুই নেই। পুরুষ আর নারী, পরস্পরের প্রয়োজনের জন্যেই তৈরী হয়েছে। পুরুষ আর নারীর মধ্যে যেটুকু পার্থক্য, সে-পার্থক্যকে যখন অস্বীকার করা কোন মতেই চলে না, তখন তা নিয়ে অকারণে মাথা-ব্যথা করে লাভ কি? দেহগত লজ্জার কোন মানেই হয় না। সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। শাদা চামড়াওয়ালা মানুষগুলো তাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছে হরেক রকমের ভণ্ডামি। আরে, মানুষ কোন্ জিনিস লুকোয়? যদি কোথাও কোন আঘাতের দাগ থাকে,

যদি কোথাও কোন গোলমাল থাকে, তবেই তাকে মানুষ ঢেকে রাখতে চেষ্টা করে। নইলে, পুরুষই হোক্, আর নারীই হোক্, যা তার স্বাভাবিক, যা তার প্রকৃতিগত শক্তি, যা তার সৌন্দর্য, তাকে সে লুকোতে যাবে কেন ? হাঁ, এমন যদি কোন উদ্ভট জিনিস থাকে, যা দেখে মানুষ হাসতে পারে বা উপহাস করতে পারে, তা না হয় লুকোন চলে !

বাতোয়ালা খেতে আরম্ভ করে···কাসাভা-দানার ভাত শেষ ক'রে গুটি-পোকার ঝোলের বাটিতে হাত দেয়···গুটি পোকা নিঃশেষ করে শেষকালে মুখে দেয় আলু সেদ্ধ। দু'তিন গ্রাস খাদ্যের পর এক-একবার 'কেনে'র ভাঁড় তুলে নিয়ে চুমুক দেয়··· 'কেনে' হলো তাদের দেশের "বিয়ার", ভুট্টার বীচি পচিয়ে তৈরী করা হয়।

পরিতৃপ্তভাবে ভোজন শেষ করে বাতোয়ালা ইয়াসী গুইন্দজাকে ঈঙ্গিত করে, তামাকের হুঁকাটা আবার তার কাছে এগিয়ে দেবার জন্যে। মৌজ করে বসে অনেকক্ষণ ধ'রে গড়গড়াটি নিয়ে টানের পর টান দিতে থাকে। দিনটার আরম্ভ মন্দ গেল না, খুসী হয়েই হুঁকোটা নামিয়ে রেখে দেয়। তারপর পা ছড়িয়ে ডান পায়ের আঙুলগুলো নেড়ে-চেড়ে পরীক্ষা ক'রে দেখে, 'সিগ্ড়ে' অর্থাৎ পোকা-মাকড় কিছু আছে কিনা। এই সিগ্ড়ের উৎপাতের জন্যে বেচারা নিগ্রোদের সর্বদাই উদ্ব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়। একদিন যদি অন্যমনস্ক হয়ে পায়ের

আঙুলের দিকে নজর না দিয়েছে, তা হলে রাতারাতি আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে সিগ্‌ড়েগুলো হাজার হাজার ডিম পেড়ে বসবে··· একটা সিগ্‌ড়ে যে কত ডিম পাড়তে পারে, তার কোন হিসেব-নিকেষ নেই।

শাদাচামড়া-ওয়ালা লোকদেরও সিগ্‌ড়েরা ছেড়ে দেয় না। কিন্তু তাদের কথা হলো আলাদা। তাদের চামড়া এমন যাচ্ছেতাই রকম নরম যে একটা সিগ্‌ড়ে গিয়ে বসলেই, তারা জানতে পেরে যায়, ভয়ে ছটফট করতে থাকে। তক্ষুণি বয়কে ডাক পাড়ে। বয় এসে চামড়া থেকে সিগ্‌ড়েটাকে খুঁজে বার করে যতক্ষণ না মেরে ফেলছে, ততক্ষণ তারা চেঁচাতেই থাকবে।

কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা করে কি লাভ? কে না জানে যে, শাদা লোকগুলোর গায়ের চামড়া নিগ্রোদের মতন শক্ত মজবুৎ নয়?

নিগ্রোদের গায়ের চামড়া মজবুৎ বলেই শাদা লোকগুলো হাজার রকমে তার সুযোগ নেয়। একটা উদাহরণ দিলেই তা বোঝা যাবে। ট্যাক্‌স্ আদায় করবার ফিকিরে শাদা লোক-গুলো নিগ্রোদের দিয়ে পাহাড়-প্রমাণ বোঝা বইয়ে নেয়। একদিন দুদিন নয়, ক্রমান্বয়ে চার-পাঁচদিন ধরে সমানে এই সব বোঝা কাঁধে করে তাদের চলতে হয়···এই সব বোঝার ওজন যে কত ভারী, একজন মানুষ বইতে পারে কিনা, তা শাদা লোকগুলো একবার ভেবেও দেখে না! রোদ হোক্, বৃষ্টি হোক্,

গরমে গায়ের চামড়া জ্বলে পুড়ে যাক, তাদের বোঝা বয়ে চলতেই হবে! শাদা লোকগুলোর আর কি···তারা ভুলেও রোদে আসে না···সব সময়ে তারা তাদের ছাউনীর ছায়ার ভেতরে থেকে শুধু হুকুম দিয়েই খালাস···সুতরাং, বুঝছো তো, নিগ্রোদের চামড়া কতখানি শক্ত!

হায় শাদা-চামড়া! হায় রে শাদা চামড়াওয়ালা!

মশা দেখলেই তারা ক্ষেপে ওঠে। গালাগাল দিতে সুরু করে। মশার ডাক শুনলেই তাদের মেজাজ বিগড়ে যায়। ভাঙা কুঁড়ে ঘরের ফাটলে কিম্বা পুরানো ভাঙা বাড়ীর পাথরের তলায় যে সব বিছে থাকে, কালো কালো সব "প্রাকঙ্গো", যমের মতন ওরা তাদের ভয় করে। ঘরের আশে-পাশে বন-জঙ্গলে যে সব মাছি ঘুরে বেড়ায়, তাদের জন্যেও ভয়ে ওদের ঘুম ছুটে যায়। আমাদের আশে-পাশে চারদিকে যে সব ছোট ছোট প্রাণী, খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যারা মানুষ বলে নিজেদের পরিচয় দেয়, তারা কেন তাদের দেখলে এত ভয় পাবে? কেন তাদের জন্যে রাতদিন এতো ছুর্ভাবনা? হায়রে শাদা চামড়া! হায়রে শাদা চামড়াওয়ালার দল!

শাদা লোকগুলোর পা? জঘন্য! পা, না খেলনা? রাতদিনই বাক্সের ভেতর পা দুটোকে বন্ধ করে রেখে দেয়···লাল, নীল, হলদে কত রকমের চামড়া দিয়ে বেঁধে লুকিয়ে রাখে! কেন, পায়ে ঘা হয়েছে নাকি? তাই রাতদিন বেঁধে রাখতে হবে?

আরে শুধু পা-ই বা কেন? ওদের সারা গা বোধ হয় ঘেয়ো···রাতদিনই ঢেকে রাখে। গা থেকে যেন মড়ার গন্ধ বেরুচ্ছে।

তাও না হয়, সহ্য করা যায় কিন্তু দোহাই ভগবান্, ভগবানের দেওয়া চোখ দুটোও সব সময় ঢেকে রেখেছে, শাদা, হল্‌দে, নীল কত রকমের কাঁচ দিয়ে! তাতেও কি ক্ষান্ত থাকে? কোথাও কিছু নেই, সারা মাথাটা নানান রকমের ছোট ছোট চুবড়ী দিয়ে ঢেকে রাখে! আশ্চর্য!

পায়ের আঙুলের পোকা বাছতে বাছতে বাতোয়ালা আপনার মনে ভেবে চলে···মাঝে মাঝে ঘাড় মুখ বেঁকিয়ে খানিকটা থুতু ফেলে যেন ভেতরকার কতকটা ঘৃণা সেইভাবে বেরিয়ে গেল!

সত্যিই, এই সাদা লোকগুলোকে সে অন্তর থেকে ঘৃণা করে। ভয়ও করে। তারা অতিরিক্ত ধূর্ত। তারা জানে না, এমন কিছুই পৃথিবীতে নেই, সেইজন্যেই তাদের এত ভয় করে। ইদানীং এই শাদা লোকগুলোর মধ্যে কেউ কেউ, তাদের দেশ ফ্রান্স থেকে, কাঠের তৈরী একটা আশ্চর্য যন্ত্র নিয়ে এসেছে, তার ভেতর থেকে ঠিক এই শাদা লোকগুলোর মতন কারা সব কথা বলে, গান গায়। বাতোয়ালা ভেবেই ঠিক করে উঠতে পারে না, কি করে তা সম্ভব হয়, আর কেনই বা হয়?

তা ছাড়া, সে নিজের চোখে দেখেছে, ওরা খাবার-টেবিলে

বসে, ছুরি···হাঁ, ছুরি পর্যন্ত গিলে খায়!

এ নিয়ে তর্ক করে কোন লাভ নেই! এ অঞ্চলে হেন লোক নেই, যে সেই ভয়ঙ্কর শাদা লোকটার নাম না জানে··· মারো কাম্‌বা, যে লোকটা আগুন দিয়ে বান্‌ডাদের ঘর দোর সব জ্বালিয়ে দিয়েছিল···কে না জানে যে মারো-কাম্‌বা যে-সে সেনাপতি নয়, সে রীতিমত তলোয়ার গিলে খেতে পারতো?

তাছাড়া ওদের অনেকের কাছেই এমন এক অদ্ভুত যন্ত্র আছে, যা চোখে লাগিয়ে ওরা বারাণ্ডাতে বসেই বহু দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পায়···ঘরে বসেই ওরা দেখতে পায় দূরে বহুদূরে চোখের আড়ালে কি সব ঘটছে···আশ্চর্য নয়? ভয় না করে উপায় কি?

হাঁ···আর একটা ব্যাপার···ওদের ভেতর যারা ওঝা··· তাদের ওরা বলে "ডক্‌তোরো"···সেই ডক্‌তোরোগুলো কি সাংঘাতিক লোক···যদি ইচ্ছে করে তোমাকে দিয়ে নীলজল প্রস্রাব করিয়ে দিতে পারে! হাঁ···নীল···সত্যিকারের নীলজল!

কিন্তু···তার চেয়েও ভয়ঙ্কর আর এক ব্যাপার আছে।

কিছুদিন আগে, ফ্রান্স থেকে যে নতুন সেনাপতি এসেছে, সবাই দেখেছে, সে হাসতে হাসতে নিজের হাত থেকে এক পুরু চামড়া তুলে পকেটে রেখে দিল! যদিও সেটা ঠিক, তার গায়ের চামড়ার মতন দেখতে নয়···কিন্তু, তাতে কি যায় আসে? সেটা যে আসল চামড়া, তাতে কোন সন্দেহ নেই! আসল ব্যাপার

হলো, লোকটা যন্ত্রনায় একটুখানিও মুখ বেঁকালো না…হাসতে হাসতে এক পুরু চামড়া খুলে ফেল্লো!

দরকার হলে তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের দাঁত পর্যন্ত খুলে ফেলে সামনে রেখে দেয়। শুধু কি দাঁত, এক একটা চোখও তারা হাসতে হাসতে খুলে সামনে রেখে দেয়, আবার দরকার হলে লাগিয়ে নেয়। কি সাংঘাতিক লোক ওরা!

না, তাদের কোন ওঝাই আজ পর্যন্ত এ-রকম যাদু দেখাতে পারে নি। এ-রকম যাদু-শক্তি তাদের কোন ওঝারই নেই। ভাবতে ভাবতে ঘৃণার পরিবর্তে এক সভয় শ্রদ্ধা তার মনে জেগে উঠতে থাকে…

সূর্য তখন ঠিক মাঝ-আকাশে এসে দাঁড়িয়েছে। যথারীতি সে-সংবাদ ঘোষণা ক'রে ডেকে উঠে কালো পাখীর দল। সমস্ত প্রকৃতি রোদে ঝিম্ হ'য়ে নীথর পড়ে আছে। যেন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সব কিছুই ঘুমিয়ে পড়েছে। লম্বা-শীষ-ওয়ালা ঘন ঘাসের বন নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে, এতটুকু বাতাসের চিহ্ন তাদের অঙ্গে ধরা পড়ে না। শুধু তিনবার মাত্র, ঠিক এমনি দুপুরের সময় রোজ কোন্ রহস্যলোক থেকে আসে তিন ঝলক দমকা হাওয়া, দুলে উঠে ঘাসের বন, তারপর আবার নিশ্চল নিশ্চুপ! দূরে ধোঁয়ার কুণ্ডলীকে যেমন মনে হয় স্থির অচঞ্চল, তেমনি স্থির অচঞ্চল দাঁড়িয়ে আছে ভূলো-গাছগুলো……একটা পাতাও ভুলে যেন নড়ে না।

বাতোয়ালা উঠে পড়ে···আর বসে থাকা চলে না। এ-বার সুরু করতে হবে দিনের কাজ।

কিছুদূরে মাঠের ধারে একটা ঢিবির মত উঁচু জায়গা ছিল বাতোয়ালা সেই ঢিবির দিকে এগিয়ে চলে। সেই ঢিবির ওপর তিন জায়গায় থাকের পর থাক তার নিজস্ব তিনটে "লিংঘা" (জয়ঢাক) ছিল। মাটী থেকে দুটো মুগুর তুলে নিয়ে সবচেয়ে বড় লিংঘাটার ওপর দুবার আঘাত করলো ধীরে, মেপে মেপে। সমস্ত নির্জনতা সে-শব্দে মুখর হয়ে উঠলো।

লিংঘার আওয়াজ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত আবার সব চুপ-চাপ। আবার মুগুর দুটো তুলে নিয়ে দুবার আঘাত করলো লিংঘায়। গুরুগম্ভীর শব্দে আবার ভরে উঠলো বাতাস। ধীরে ধীরে সে-শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতোয়ালার হাতের স্পর্শে এবার সবগুলো লিংঘা থেকে, গুড়, গুড়, টম্ টম্ শব্দ একসঙ্গে জেগে ওঠে, প্রথমে ধীরে, তারপর দ্রুত, তারপর আরও দ্রুত, শেষকালে সর্বোচ্চ সুর থেকে আবার ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে মৃদু কোমল হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যায়।

বাতোয়ালা দূরের দিকে চেয়ে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতে, মেঘ-গর্জনের মতন, খুব কাছ থেকে, তারপর কিছু দূর থেকে, আরো দূর থেকে, বাঁ দিক থেকে, ডানদিক থেকে, চারদিক থেকে প্রত্যুত্তর আসতে সুরু করলো।

ঠিক তারই শিংঘার মতন আওয়াজ দূর থেকে তার কাছে বাতাসে গড়িয়ে গড়িয়ে আসতে লাগলো, তার আহ্বানের প্রত্যুত্তরে। তারা শুনতে পেয়েছে, তারা সাড়া দিয়েছে। বাতোয়ালা সেই শব্দের অরণ্যের মধ্যে প্রত্যেক শব্দটাকে আলাদা বেছে নিতে পারে, কোন শব্দটা ক্ষীণ মৃদু, কোন শব্দটা যেন কুণ্ঠিত, কোনটা যেন অনিশ্চিত, কোনটা যেন স্পষ্ট, উল্লসিত···এক কাগা থেকে আর এক কাগায় তার প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে, এমনি তীব্র আর প্রবল। এক নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য দূর-দূরান্তর প্রাণ-সজীব হয়ে উঠে।

বাতোয়ালার আমন্ত্রণ-ধ্বনির প্রত্যুত্তরে দূর-দূরান্তর গ্রাম থেকে শব্দের সাহায্যে তারা বলে পাঠালো, আমরা শুনেছি··· আমরা শুনেছি তোমার ডাক···আমরা সবাই সজাগ হয়ে আছি···বল···কি বলতে চাও? কথা বল!

দু'বার দূর-দিগন্ত থেকে ঠিক একই রকমের শব্দের তরঙ্গ ভেসে এল। তাদের শেষ আওয়াজটুকু মিলিয়ে গেলে বাতোয়ালা আবার বলতে সুরু করলো। আবার বেজে উঠলো তার লিংঘা।

প্রথমে বাতোয়ালা ধীরে সুস্থে নিজেদের ছোটখাটো সুখ-দুঃখের কথা জানায়···লিংঘার আওয়াজে থাকে না কোন জোর। প্রতিদিনের সেই একঘেয়ে জীবনের ক্লান্তি আর অবসাদের কথা, নিরানন্দ নির্জন জীবনের অভ্যস্ত শ্রান্তি···কোন আনন্দের

সম্ভাবনা নেই···নতুন কোন বিপদের আতঙ্ক নেই···যা আছে, মুখ বুজে শুধু তাকে স্বীকার করে নেওয়া···বাতোয়ালার হাতের স্পর্শে তার লিংঘায় জেগে ওঠে সেই অমোঘ ভবিতব্যতার কথা ···শ্রান্ত, ক্লান্ত, মন্থর।

ক্রমশঃ বাতোয়ালার হাতের মুগুর পালা করে তিনটে লিংঘার ওপর সমানে পড়তে থাকে···আওয়াজ ক্রমশ দ্রুততর, উচ্চতর হতে থাকে—যেন ধীরে ধীরে ঝড় জেগে উঠছে···দেখতে দেখতে সমস্ত আকাশ ভরে ওঠে তার শব্দের সঙ্গীতে···হঠাৎ এক জায়গায় এসে থেমে যায় সঙ্গীত···ক্ষণিকের বিরাম···পূর্ণ নিস্তব্ধতা···আবার সুরু হয়, এবার সুরু থেকেই ঝড়ো শব্দের চড়া আওয়াজ···গুরু গম্ভীর গর্জন···গর্জন প্রতি মুহূর্তে বেড়ে চলে···

বাতোয়ালার সারা অঙ্গ বেয়ে দর-ধারায় ঘাম ঝরে পড়ে। সে উল্লসিত। তার মনের কথা সে স্পষ্ট করে সকলকে জানিয়েছে! হাতের মুগুর চালানোর সঙ্গে সঙ্গে নাচতে সুরু করে দেয়।

সে আজ তাদের সবাইকে ডাকছে···দূর-দূরান্ত গ্রামে যেখানে তার অনুগতজনেরা আছে, তাদের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, বন্ধু-বান্ধব, বন্ধুদের আবার যারা বন্ধু আছে তাদের সকলকেই সে আমন্ত্রণ জানায়। অন্য গ্রামে যারা মোড়ল, যাদের সঙ্গে সে করেছে প্রাণ-বিনিময়, যাদের রক্ত সে পান করে নিজের দেহে নিয়েছে, তার রক্ত যারা পান করে তাদের দেহে নিয়েছে—যাদের

প্রত্যেককে দেয় ডাক। ন' দিনের ভেতর তাদের সকলকে এসে জড় হতে হবে, গান্‌জা-উৎসব উপলক্ষে বিরাট এক 'ইয়াংবার' আয়োজন সে করবে, সে-নৃত্য-উৎসবে তাদের সকলেরই নিমন্ত্রণ। সে-বিরাট আয়োজনে তাকে সাহায্য করবার জন্যে, সবাইকে সে আজ ডাক দেয়।

অদ্ভুত এই লিংঘার আওয়াজ। যুগের পর যুগের চেষ্টায় তারা গড়ে তুলেছে এই বিস্ময়কর ভাষাকে। তারই সাহায্যে বাতোয়ালা আজ এক নিমেষে ছড়িয়ে দিল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তার নিমন্ত্রণের সংবাদ। এবং সে-সংবাদের মধ্যে তারা খবর পেয়ে গেল, কি বিরাট উৎসব আর আনন্দেরই আয়োজন সে করছে। খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান, সারাদিন, সারারাত ধরে চলবে উৎসব। যত রকম নাচ আছে, সব নাচেরই আয়োজন সে করবে। হাতী-নাচ, বর্শা-নাচ, যুদ্ধের নাচ, কোন নাচই বাদ যাবে না। সবার ওপরে থাকবে, সকলের চেয়ে সেরা নাচ, ভালবাসার নাচ···কালো কাফ্রী তরুণী মেয়েরা যে-নাচে রেখেছে তাদের মুগ্ধ ক'রে।

সারাদিন চলবে খাওয়া আর নাচ, নাচ আর খাওয়া, সারারাত চলবে পাত্র ভরে পান আর নাচ, নাচ আর পাত্র ভরে পান। ক্যাসাভা দানার ভাত, আলু, কুমড়ো, ইয়াম্‌, নাড়ালো, ভুট্টা···কি মধুরই না ভুট্টা দানার বিয়ার! জালা ভর্তি থাকবে ভুট্টা দানার বিয়ার! কুমীরের ডিম-সেদ্ধ আর বিয়ার! প্রচুর

পরিমাণে থাকবে কুমীরের ডিম, মাছ, মাংস! প্রত্যেককেই আসতে হবে···হাঁ···হাঁ···সকলের আসা চাই-ই!

নিমন্ত্রণ শেষ হয়ে গেলে, বাতোয়ালা কয়েক মুহূর্ত ঘাড় উঁচু করে দূরের দিয়ে চেয়ে রইলো···যেন কার উত্তরের অপেক্ষায় আছে। সহসা নীরবতাকে ভঙ্গ করে দূর থেকে আবার ভেসে আসতে সুরু করে সঙ্গীতের মতন বিচিত্র সব আওয়াজ···বাতোয়ালা স্পষ্ট বুঝতে পারে, আলাদা আলাদা করে প্রত্যেক গানের আলাদা লাইন,—

"শুনলাম, তোমার সব কথাই আমরা শুনেছি···বুঝেছি কি বলতে চাইছো তুমি···তুমি আমাদের সেরা, সকলের সেরা, সকলের সেরা বাতোয়ালা তুমি···আমরা আসবো...আমরা আসবো সবাই আসবো তোমার আমন্ত্রণে···নিশ্চয়ই, সঙ্গে নিয়ে যাবো আমাদের বন্ধুদের···ফুর্তি করবো, নাচবো, গাইবো সারাদিন সারারাত...শাদা লোকদের মত স্পঞ্জের মতন শুষে নেবো তোমার মদের জালা···আমাদের প্রত্যেকের গাঁয়ের হয়ে আমরা প্রত্যেকে কথা দিচ্ছি—আমি ঔয়ো—আমি ওহোরো—আমি কাঙ্গা—ইয়াবিংগুই—ডেলেপো—তেঙ্গোমালি—ইয়াবাদা—প্রত্যেক মোড়ল, আমরা কথা দিচ্ছি—আমরা যাবো—আমরা যাবো—"

ধীরে ধীরে দিগন্ত-রেখায় ক্রমশ মিলিয়ে যায় তাদের কথাবার্তা—বাতোয়ালা লিংঘার কাছ থেকে নেমে আসে—

সোজা পথ ধরে এগিয়ে চলে যেখানে বাম্বা আর পোম্বা এক জায়গায় এসে মিশেছে—সেখানে আগের দিন জলের ভেতর বসিয়ে রেখে গিয়েছিল মাছ ধরবার ঝাঁঝ্রী। দেখতে হবে, কতটা মাছ ধরা পড়লো।

যাবার সময় সে সঙ্গে তুটো বর্শা, একটা ধনুক, একটা থলে আর একটা ছাগলের চামড়া নিয়ে নিল।

মানুষ যেখানেই যাক্- যত কাছেই হোক না কেন, সঙ্গে করে একটা থলে নিয়ে যাওয়া চাই-ই। কত না জিনিস তার ভেতর লুকিয়ে রাখা চলে!

সেই সঙ্গে সে তুটো বিম্বি পাতা নিয়ে নিল। ধনুকের জন্যে তূণে কতকগুলো কাঁটা-ওয়ালা তীর ভরে নিল। আর নিল গোটাকতক ক্যাসভা-দানার পিঠে। খাদ্য।

আর কি দরকার! এই নিয়ে সে জগতের যে-কোন বিপদের সামনে নির্ভাবনায় দাঁড়াতে পারে। আত্মরক্ষার জন্যে রইল তীর, ধনুক আর বর্শা। ক্ষুধার জন্যে রইল ক্যাসাভা-দানার পিঠে। তার ওপর, যদি তেমন কিছু আবার দরকার পড়ে, সঙ্গে তো বিম্বি পাতা আছে। মাছের খলুই-এর ভেতর একটা বিম্বি পাতা ফেলে দিলে, যে কোন মাছই ঠাণ্ডা হিম হয়ে যাবে।

নিশ্চিন্ত মনে বাতোয়ালা হাঁটতে সুরু করে।

এক্-পা করে পথ চলে আর পায়ের তলার মাটী খুঁটিয়ে দেখে নেয়। চিরকালের অভ্যাস। পিতা-পিতামহদের কাছ

থেকে পাওয়া নানান অভ্যাসের মতনই এটাও হয়ে গিয়েছে স্বভাব। যতই বয়স বাড়তে থাকে, ততই বুঝতে পারে, এই সব অভ্যাসের দাম কতখানি।

শাদা লোকেরা জানে না, পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে এইভাবে মাটীকে খুঁটিয়ে দেখার মূল্য কতখানি। কত সামান্য সামান্য ব্যাপারই তারা জানে না! পায়ে পাথরের কুচি লাগতে পারে। কাদায় পা হড়্‌কে যেতে পারে, খানায় বা ডোবায় পা মুচ্‌কে যেতে পারে। একটু নজর রাখলেই যদি তা থেকে বাঁচা যায়, নজর রাখতে ক্ষতি কি! তার জন্যে তো আর আলাদা সময় নষ্ট করতে হয় না। তা তাড়া, মানুষের যত বুদ্ধি বাড়ে, মানুষ ততই বুঝতে পারে, সময়ের তো আলাদা কোন দামই নেই··· সময়ের মধ্যে যেটুকু পাওয়া যায় সেইটুকুই তো সময়ের দাম! তা ছাড়া, সময়ের আবার দাম কি!

বাতোয়ালা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাতোয়ালার ঘরে এসে উপস্থিত হয়, বিসিবিংগুই।

ভরা যৌবন···লিক্‌লিকে ছড়ির মতন দেহ। সবল···সুন্দর।

বাতোয়ালার ডেরায়, যখনই সে আসুক না কেন, তারজন্যে এক থালা খাবার আর তার শোবার জন্যে একটা বোগ্‌বো সব সময়ই প্রস্তুত থাকে। বাতোয়ালার সে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাই এই বিশেষ খাতিরটুকু বাতোয়ালা তারজন্যে আনন্দেই বরাদ্দ করে রেখেছে।

শুধু যে বাতোয়ালাই তাকে এইভাবে স্নেহ করতো, তা নয়। বাতোয়ালা জানে না, তার অসাক্ষাতে তার ন' জন স্ত্রীর মধ্যে আটজনই বিসিবিংগুইকে তাদের অন্তরের প্রীতির প্রত্যক্ষ নিদর্শন জানাতে দ্বিধা করে নি। একমাত্র এখনো পর্যন্ত এই কার্যে বাদ দিয়েছিল, তার প্রধানা স্ত্রী, ইয়াসী গুইন্দজা। তবে, ইদানীং একটু লক্ষ্য করলেই বেশ বোঝা যায় যে ইয়াসীগুইন্দজা তার মহিমান্বিত স্বামীর আদেশের চেয়ে বিসিবিংগুই-এর আদেশকেই যেন বেশী সমীহ করে চলছে। ইয়াসীগুইন্দজা শুধু অপেক্ষা করে আছে একটা ভাল রকমের সুযোগের জন্যে, যে-সুযোগের শুভ-লগ্নে সে তার অন্তরের কামনা বিসিবিংগুইকে নিবেদন করতে পারবে।

পুরুষের কামনাকে প্রত্যাখ্যান করা নারীর শোভা পায় না। নারীর কামনা সম্বন্ধে পুরুষেরও সেই একই কর্তব্য। এই হলো স্বভাব-ধর্ম। স্বভাব-ধর্মকে মেনে চলাই হলো সর্বোচ্চ আইন। একজন নারীকে যে একজন পুরুষেরই সম্পত্তি হয়ে থাকতে হবে, এমন কোন কথা নেই। তাই স্বামীকে প্রতারণা করার মধ্যে খুব একটা ভয়ঙ্কর ক্ষতি বলে কিছু নেই।*

*পাঠকদের অবগতির জন্যে স্পষ্ট করে বলতে বাধ্য হচ্ছি, এটা লেখকের মত বা সিদ্ধান্ত নয়। আফ্রিকার আদিম অধিবাসীরা যে-ভাবে এই প্রশ্নকে দেখে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই তাদের কথাই এখানে বলা হয়েছে।

অপরের সম্পত্তি সাময়িক ভাবে ভোগ করার দরুণ যদি ক্ষতিপূরণের কথা একান্তই ওঠে তা হলে আসল মালিককে ক্ষতি-পূরণ বাবদ গোটাকতক মুরগী ও ছাগল ছানা বা দরকারী কাপড়-চোপড় দিয়ে পুষিয়ে দিলেই হলো। তারপর সবই ঠিক হ'য়ে যাবে।

অবশ্য, সব ক্ষেত্রে যে এইভাবে মীমাংসা হ'য়ে যাবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। অন্তত বাতোয়ালার ক্ষেত্রে তা সম্ভব হবে না, তাতে কোন সন্দেহই ছিল না। সেখানে সে দুর্দান্ত ক্ষমাহীন, কোন প্রতিদ্বন্দীকেই সে সহ্য করবে না, করতে পারে না। যাই বলুক লোকাচার, আর যাই হোক না কেন সনাতন সামাজিক রীতিনীতি, তার সম্পত্তির ওপর যারা হাত দেবে, তাদের ধ্বংস করে ফেলতে তার এতটুকুও কোথাও বাধবে না। রীতিমত চড়া দাম দিয়ে সে ইয়াসীগুইন্দজাকে কিনে এনেছিল —সে জমির ষোল-আনা মালিক সে—সেখানে তারই একমাত্র অধিকার বীজ বপন করবার। ইয়াসীগুইন্দজা সে-কথা ভাল করেই জানতো! তাই সে এতদিন পর্যন্ত নিজের স্বভাব-ধর্মকে দমন করেই রেখেছে।

গত দু' তিন চাঁদ ধরে ইয়াসীগুইন্দজা লক্ষ্য করে দেখেছে, বিসিবিংগুই ইদানীং যাওয়া-আসা খুবই কমিয়ে দিয়েছে। তাই আজকে তার হঠাৎ আবির্ভাব তাকে উতলা করে তোলে।

একদিন ঘোর বর্ষার মধ্যে বিসিবিংগুই জন্মেছিল। তারপর

থেকে ষোলটা বর্ষা চলে গিয়েছে। আজ সেই ষোল বর্ষার জল তাকে যৌবনে ভরপূর করে তুলেছে। ঠিক এই বয়সে, মানুষের মত তাজা মানুষ যারা, তাঁরা চব্বিশ ঘণ্টা শীকার করে বেড়ায় ·· স্ত্রীলোককে। ঠিক যেমন তাদের চোখের সামনে বনে শীকার করে ঘুরে বেড়ায় নেকড়ে বাঘ তরুণী হরিণীর খোঁজে।

দেখতে দেখতে চোখের সামনে বিসিবিংগুই পাতার আড়ালে লুকানো ফলের মতন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তার দেহের প্রত্যেক পেশী সে-সংবাদ সগর্বে ঘোষণা করছে। তবে, তাকে হরিণীর পেছনে ছুটতে হয় না, হরিণীরাই তার খোঁজে ছুটে বেড়ায়। কালো ইয়াসী, আর বুনো হরিণী, দুই-ই এক। তবে নেকড়ের কাছে ধরা দিতে হরিণীর কোন আনন্দ নেই। কিন্তু ইয়াসীরা আনন্দে ধরা দেয় তার কাছে। শ্রদ্ধা করে তার সম্পূর্ণ বলিষ্ঠতাকে, পরিপূর্ণতাকে। তার জন্যে অনেক ঘরে অনেক দম্পতীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে, অনেক ঝগড়া বাদবিতণ্ডা হয়ে গিয়েছে। ক্রমশ ব্যাপার এতদূর পর্যন্ত গড়ায় যে, লোকে তার নামে কমাণ্ডারের কাছে নালিশ করতে বাধ্য হয়। নালিশের পর নালিশ পেয়ে একদিন কমাণ্ডার তাকে ডেকে পাঠিয়ে শাসিয়ে দেয়, ফের যদি তার সম্বন্ধে এই নালিশ আসে, তাহলে তাকে ধরে জেলে আটক করে রাখা হবে।

তার ফলে তরুণী ইয়াসীদের মহলে তার খ্যাতি আরো বেড়েই যায়।

তাই বহুদিন পরে বিসিবিংগুই-এর অকস্মাৎ আবির্ভাবে বাতোয়ালার কুটীরবাসিনীরা আনন্দমুখর হয়ে উঠলো। সকলেই ছুটে এল সাদর অভিবাদন জানাবার জন্যে। প্রত্যেকের মুখেই প্রশ্ন, কোথায় ছিলে? কি করছিলে? এখানে সেই যে শেষ এসেছিলে, তারপর কত নতুন মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলো? তাদের নাম কি? শুনলাম, অমুক মেয়ের সঙ্গে ··· সে কি সত্যি? এই ধরণের শত অন্তরঙ্গ প্রশ্ন চারদিক থেকে তাকে আক্রমণ করল।

কোন রসিকতাতেই হাঁ কি না, কোন সাড়া না দিয়ে সে হাসতে হাসতে বাতোয়ালার পরিত্যক্ত হুঁকোটা তুলে নিল, ঘন করে তামাক পাতা ঠেসে একটা জ্বলন্ত কাঠকয়লা তার ওপর তুলে দিল।

পাতা ধরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মাদুরে হাত-পা ছড়িয়ে বসে মনের সুখে হুঁকোতে টান দিল। ছোট ছোট ধোঁয়ার কুণ্ডলী গোল হয়ে বাতাসে মিশে যেতে লাগলো।

ইয়াসীগুইন্দজা গম্ভীর চালে বলে ওঠে, মেয়েমানুষদের নিয়ে এ-রকম খেলা ভাল নয়···তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, তাদের সম্বন্ধে একটু সাবধানেই চলো। কোন্‌দিন দেখবো, সারা অঙ্গে ঘা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো!

ইয়াসীগুইন্দজার কথায় তার আটজন সপত্নী হি-হি করে হেসে ওঠে।

—এ-হি···হি···হি···ইঃ···ইয়াবোয়া······ইয়াসীগুইন্দজের কথা শোন···এ-হি···হি···হি···"

উপযুক্তভাবে হয়ত সাবধান করা হলো না, মনে করে ইয়াসী গুইন্দজা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বলতে সুরু করে, "কাসিরি ঘা তো, তবু ভালো···তার চেয়েও ভয়ংকর জিনিস আছে বন্ধু ! সারা গায়ে চাকা চাকা দাগ হবে···নেকড়ের মত···মাংস খসে খসে পড়বে···অমন যে দাঁত, তার একটীও থাকবে না···ময় মাথার চুল, হাতের আঙুল পর্যন্ত ! মনে নেই, ইয়াকেন্-লেপিনের কথা ? এই তো তিন চাঁদ, কি চার চাঁদ আগেও তো সে বেঁচে ছিল !"

আবার তারা সকলে অট্টহাস্য করে উঠলো।

তারা হাসছিল, এমন সময় বাতোয়ালা এসে হাজির হয়। হাসির কারণ বাতোয়ালাকে তারা জানিয়ে দেয়।

বাতোয়ালা তাদের হাসিতে যোগদান করে। সবাই মিলে অট্টহাস্য করে ওঠে। আলাপে, রসিকতায় মশগুল হয়ে যায়। হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে···গড়াগড়ি দেয়···চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

—"এ-হে-হে···হিঃ-হিঃ···হিঃ···বাতোয়ালা গো···ও হো-হো ···ওঃ···ওঃ···"

ক্রমশ সূর্য অস্তে বসে।

একটু একটু করে নীড়ে ফিরে-আসা পাখীর কাকলী ক্ষীণ

না। তারা অনেক বচসা করার পর ঠিক করলো যে, এ পরীক্ষায় অনেক সময় ঠিক ঠিক ফল পাওয়া যায় না, সুতরাং ইয়াসীগুইন্দজাকে কঠিনতর পরীক্ষা দিতে হবে···তাকে বিষ-পরীক্ষা দিতে হবে......

কাতরভাবে সে এই সব কথা বিসিবিংগুইকে জানায়। বলে, আমি অবশ্য এই বিষ-পরীক্ষা দিতে ভয় পাচ্ছি না। আমি জানি, এই বিষের প্রতিষেধক কি···সেটা আগে খেয়ে নিলে, তাদের দেওয়া বিষ আমার কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু তাতেও তো তারা আমাকে রেহাই দেবে না! আমি জানি, তার পর তারা যে পরীক্ষা দিতে বলবে, তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তারা আমার চোখে "লাচা" ঢেলে দিয়ে দেখবে, আমি দেখতে পাই কিনা। যদি দেখতে পাই, তাহলে আমি নির্দোষ আর যদি দেখতে না পাই, তা হলেই তারা আমাকে দোষী সাব্যস্ত করবে। আমি তো লাচার প্রতিষেধক কি জিনিস আছে, তা জানি না। কাজেই দুটি চোখ আমার একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। কিছুই দেখতে পাবো না। তখন তারা আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে প্রহার করতে সুরু করবে, ঢিলিয়ে আমাকে মেরে ফেলবে। আমি জানি একদল বুড়ো আমার ওপর ভীষণ রেগে আছে, তাদের কথামত আমি তাদের দেহ দিই নি; তারা সেই রাগের প্রতিশোধ এবার নেবে।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে সে আবার বলতে আরম্ভ করে, জানো বিসিবিংগুই, তারা কিভাবে আমাকে নির্যাতিত করবে? গরম ফুটন্ত জলে আমার হাত জোর করে ডুবিয়ে ধরে রাখবে··· জ্বলন্ত, টকটকে লাল লোহার শিক দিয়ে কোমরে গর্ত করে দেবে···উঃ! বিসিবিংগুই, কেউ আমার কাছে আসবে না, কাউকে আসতে দেবে না···ক্ষিদেয় আর তেষ্টায় ছটফট করতে করতে মারা যাবো! তারপর তারা বাতোয়ালার বুড়ো বাপকে যেখানে কবর দিয়েছে, সেখানে তার পাশেই মাটির ভেতর আমাকে পুঁতে রাখবে। তবেই নাকি সেই বুড়োর আত্মা তৃপ্ত হবে।

সেই ভয়াবহ নির্যাতনের আশঙ্কায় সে কেঁপে ওঠে। বিস্লিবিংগুই-এর দুই হাত জড়িয়ে বলে, বিসিবিংগুই, আমি তোমাকেই চাই! তুমি জান, কতদিন থেকে কিভাবে আমি তোমাকে চাইছি···তোমাকেই শুধু চাই!

হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে। চমকে ওঠে।

"জানো, তারা আমাকে সন্দেহ করে। তারা বুঝতে পেরেছে। তাই সদা সর্বদা তারা লুকিয়ে আমার ওপর নজর রাখে। তোমাকেও তারা সন্দেহ করে। তোমারও ওপর নজর রেখেছে। হয়ত এই মুহূর্তে এই বনের ভেতর লুকিয়ে তারা আমাদের দেখছে! কিন্তু আমাদের দুজনের মাঝখানে তারা যে এইভাবে বাধার বেড়া তৈরী করছে, তাতে কি তারা আমাদের আটকে রাখতে পারবে? জল জলের সঙ্গে মিশবেই। এই তো এতো

হয়ে আসতে থাকে···দূরে কোথাও শেষ শকুনি আকাশ থেকে নেমে শেষ চীৎকারে অরণ্যের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

গ্রামের মাথার ওপর ধীরে নেমে আসে কুয়াশার অবগুণ্ঠন।

সূর্য ডুবে যায়।

মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ছাগল, হাঁস, মুরগীর দল যে-যার আশ্রয়ে ফিরে আসে আবার।

আকাশ জুড়ে এল পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। সে-মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেল রক্ত সূর্য—যেন একটা পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত আফ্রিকার রক্ত-অরণ্য-পুষ্প। মেঘের আড়াল ভেদ করে তীরের মতন দেখা যায় শুধু তার কিরণের ছটা। তাকে তখন গ্রাস করে নিয়েছে কুমীরের মতন অন্ধকার, মহাশূন্য।

ধীরে ধীরে মহাশূন্যের বুকে একটু একটু করে ফিকে হয়ে আসে রক্ত-আলোকের ছটা। ক্রমশ রক্তহীন বিবর্ণ হয়ে তারা মিশে যায় আকাশের সঙ্গে···হারিয়ে যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে নিঃসীম মহাশূন্যতায়। অন্ধকার আকাশ ঘোষণা করে সূর্যের মৃত্যু। প্রতিদিন আকাশে এইভাবে মৃত্যু ঘটে প্রতিদিনের সূর্যের। তার অন্তিম মুহূর্তের মৃত্যু-বেদনার ওপর নেমে আসে সুগম্ভীর নীরবতা। সে-নীরবতা দেখেছে শত লক্ষ সূর্যের দৈনন্দিন মৃত্যু। অবর্ণনীয় তার সুবিশাল মৌনতা।

ম্লান বিবর্ণ আকাশে বেদনার প্রদীপ হাতে মৌন-বিষাদে একে একে দেখা দেয় তারকার দল। অন্ধকারের একাধিপত্যে

আবার সুরু হয় বিন্দু বিন্দু আলোর অভিযান, চিহ্নিত হয়ে ওঠে নিশ্চিহ্ন মহাশূন্য।

সারাদিনের রৌদ্রদগ্ধ ধরণীর অঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হতে থাকে উত্তপ্ত বাষ্প।

দিক-বিদিকে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে রাত্রির হিমেল সুবাস। অন্ধকারে জন্ম নেয় শিশির-বিন্দু। বিদায়ী দিনের উত্তাপ আর আগত রাত্রির হিম-স্পর্শ মিলে গিয়ে ঝরে পড়ে শিশিরে শিশিরে। ভিজে ওঠে শুকনো মাটী। বাতাস ভারী হয়ে ওঠে বুনো লতার স্নিগ্ধ মৃদু গন্ধে। অন্ধকার ভরে যায় নামহীন পতঙ্গের অবিচ্ছেদ গুঞ্জনে।

কাছে কোথাও কুটীর-প্রাঙ্গণে কালো কাফ্রী-রমণী গম পিষছে। তার শব্দের সঙ্গে মিশে যায় বাজনার টম্ টম্ আওয়াজ।

ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠে উনুনের আগুন। ধোঁয়ার কুণ্ডলী জানিয়ে দেয়, সেখানে আছে মানুষের থাকবার কুঁড়ে ঘর।

ঘরের চারদিক ঘিরে গান সুরু করে দেয় আফ্রিকার বুনো ব্যাঙের দল। এক এক দলের এক এক রকম আওয়াজ। বাতোয়ালার ঘরে দিনের সফর শেষ করে ফিরে এসেছে জুমা, বাতোয়ালার পালিত কুকুর। ব্যাঙেদের একঘেয়ে ডাকের প্রতিবাদে সে মাঝে মাঝে চীৎকার করে ওঠে।

তাছাড়া, আর কোথাও কোন জীবনের চিহ্ন নেই। একটা

মৌন বেদনা আর মথিত অসহায়তাকে ঢেকে রাখবার জন্যেই যেন নেমে এসেছে রাত্রির অন্ধকার।

কিছুক্ষণ পরে আকাশে দেখা দেয় আইপু*, ধীরে ধীরে মেঘের পাশ কাটিয়ে চলেছে, যেমন কচুরী-পানার পাশ কাটিয়ে নদীর ওপর দিয়ে চলে নৌকো।

ইতিমধ্যেই ছ' রাত হয়ে গিয়েছে চাঁদের বয়স।

"গান্‌জা" উৎসবের ঠিক তিন দিন আগে হঠাৎ প্রবল এক ঘূর্ণী ঝড়ে সমস্ত গাঁ যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এর আগে থাকতে অতি-বৃষ্টির দরুণ যে ক্ষতি একটু একটু করে জমা হচ্ছিল, ঝড় এসে তা সম্পূর্ণ করে দিয়ে গেল।

এত বড় যে একটা ঝড় হয়ে যাবে, তার কোন লক্ষণই আগে থাকতে কিছুই দেখা যায় নি। রোজ যেমন সকাল হয়, সূর্য ওঠে, তেমনি সেদিনও গ্রিমারী গাঁয়ে ভোর হয়েছে, সূর্য উঠেছে। প্রথমটা যেমন একটু ধোঁয়াটে থাকে, তারপর বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দিব্যি ফর্সা হয়ে ওঠে, সেদিনও তেমনি রোদে-পোড়া স্বচ্ছ দিনই প্রথম দিকটায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

মাঝামাঝি দিনে, প্রতিদিন যেমন নরম হাওয়া ওঠে, তেমনি নরম হাওয়ায় ঘন সবুজ বনের বুকটা দুলে উঠলো···নরম হাওয়া, ঠাণ্ডাও নয়, গরমও নয়। গাছের পাতার আড়ালে "গোলোকোতো" পাখীর দল কূজন করতে থাকে, তাদের সঙ্গে

*চাঁদ।

যোগদান করে বৌ কৌ দৌ বা আর লিহৌয়া পাখীর দল। দেখতে চেহারায় প্রায় একই রকমের। লিহৌয়াদের সঙ্গে তফাৎ শুধু পুচ্ছের সবুজ রঙে।

ভুট্টা আর জনার ক্ষেতের ওপরে, ঘন গাছের জঙ্গলের ওপরে, গাঁয়ের ওপরে আকাশে দেখা যায়, একটি দুটি ক'রে ক্রমশ অসংখ্য শব-ভুক শকুনি···গোল হয়ে উড়তে থাকে। হঠাৎ মাটীতে খাদ্যের সন্ধান পেয়ে তাদের মধ্যে কেউ কেউ তীরের মতন নীচে ছুটে আসে, খাদ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আবার আকাশে দলে যোগদান করে।

দিনটা খুব গরমও নয়···বিশেষ ঠাণ্ডাও কিছু নয়।

বাম্বা আর পোম্বোর তীরে বানরের দল যথারীতি গাছ থেকে গাছে ঘুরে বেড়ায়। তাদের দুরন্তপনার আওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে আফ্রিকার জঙ্গলের টাগাউয়াদের অদ্ভুত ডাক কানে আসে, ঠিক যেন ছোট ছেলে কাঁদছে।

চারদিক থেকে আসে মৌমাছিদের গুঞ্জন। একটা মধু-চোর পাখী মৌচাকে মধু চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে, ঝাঁকের পর ঝাঁক মৌমাছি পাখীটাকে তাড়া করে ছোটে। তাদের ক্রুদ্ধ গুঞ্জনে বাতাস ভরে যায়। ক্রমশ দূরে তাদের শব্দ মিলিয়ে গেলেও, বাতাসে পাতার মৃদু-মর্মর ধ্বনিতে মনে হয় যেন এখনও সেই মৌমাছিরাই গুঞ্জন করছে।

গাঁয়ের ভেতর থেকে আসে গম-পেষার শব্দ। বেলা বেড়ে চলে।

হঠাৎ সেদিন মাকৌদা বাতোয়ালার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আসে। সম্পর্কে বাতোয়ালার ভাই। মাছ ধরে, জেলে। অনেকদিন পরে বাতোয়ালার সঙ্গে দেখা করতে এলো। দুটো বড় মাছ তার জালে ধরা পড়েছে। তাই ভাইকে নেমন্তন্ন করতে এসেছে। সেখানে বিসিবিংগুইকে দেখতে পেয়ে তাকেও নেমন্তন্ন করে।

সাধারণত ওদের সমাজে একটা মানুষ, যদি তার সামর্থ থাকে, তাহলে অনেকগুলি মেয়েকেই বিয়ে করতে পারে এবং প্রত্যেক স্ত্রীর ছেলেপুলে নিয়ে এক বৃহৎ সংসার গড়ে ওঠে। মাকৌদা আর বাতোয়ালার মধ্যে কিন্তু আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। একই বাপ আর একই মায়ের সন্তান তারা।

মাকৌদার আমন্ত্রণে তারা তিনজনেই বেরিয়ে পড়ে। হাঁসের মতন একজনের পেছনে আর একজন চলে। পথ চলবার এই নিয়ম। রাস্তায় পাশাপাশি কখনো হাঁটতে নেই। অনাদিকাল থেকে এই নিয়ম চলে আসছে। তাদের জাতের মতন পুরানো এইসব নিয়ম।

পেছনে জুমাও অনুসরণ করে চলে, দু' কান খাড়া করে…

বাড়ীতে বাতোয়ালার স্ত্রী-মহলে কথা ওঠে। ইন্দৌভৌরা, বাতোয়ালার অন্যতমা গৃহিণী, মুখ ভার করে বলে, একজাতের মানুষ আছে, নিজের দেমাক্ নিয়েই সারা!

স্বভাবতই ইন্দোভোরা একটু বেশী হিংসুটে, রক্তের তেজ তার কমেনি। তাকে পরিত্যাগ করে বিসিবিংগুই যে ইয়াসী-গুইন্দজার পেছনে ঘুরছে, এ ব্যাপারটা সে কিছুতেই হজম করতে পারে না।

তার কথার ইঙ্গিত বুঝে সপত্নীদের মধ্যে একজন জবাব দেয়, সত্যি, দেমাক্ দেখাতেই যেন তাদের সব সুখ!

"তাতে অবিশ্যি, কার কি যায় আসে? সেদিকে চেয়ে না দেখলেই হলো! কিন্তু কথাটা কি জানিস্, যাদের কোন দেমাক্ নেই, অনায়াসেই লোকে তাদের ঘাড়ে চাপে। কি বলো গো ইয়াসীগুইন্দজা?"

সকলে খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে। ইয়াসীগুইন্দজাকে তারা কেউই দেখতে পারতো না।

সপত্নীর প্রশ্নে ইয়াসীগুইন্দজা বলে ওঠে, তা যা বলেছিস্, সত্যি! কিন্তু কার কথা তুই বলছিস্, আমি তো ভাই বুঝতে পারছি না! সেই 'নাংগাপো' মাগীটার কথা বলছিস্···সেদিন একজন বড় মোড়লের সঙ্গে যার বিয়ে হলো?

'নাংগাপো' কথাটার মধ্যে একটা গোপন আঘাত ছিল। অতি নীচ জাত তারা এবং ইন্দোভোরা সেই নীচ জাতেরই মেয়ে। ইন্দোভোরা তৎক্ষণাৎ ধরে নেয় যে, তাকেই গালাগাল দিয়ে একথা বলা হলো। রাগে তার ভেতরে এক নিমেষে আগুন জ্বলে ওঠে।

সেই আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়ে ইয়াসীগুইন্দজা বলে, তা ভাই দেমাক্ হবে না? ওতো আবার শাদা-চামড়ারও ঘর করে এসেছে!

শেষোক্ত কথাটাও যে তাকে আঘাত করবার জন্যেই বলা হলো, সেকথা বুঝতে ইন্দোভৌরার দেরি লাগে না। হাত-পা ছুঁড়ে চীৎকার করে উঠলো, বলি ও বুড়ো মাগী···আমি কি বুঝতে পারছি না, যে তুই আমাকেই অপমান করে এই সব কথা বলছিস্? আমারও জানতে বাকি নেই তোর গুণের কথা। বাজারের মড়া, আস্তাকুঁড়ের জঞ্জাল, ফের যদি ও সব কথা বলবি তো গলা টিপে মেরে ফেলবো!

ইয়াসী—বলি, চেঁচাচ্ছো কেন বাপু? আস্তে কথা বলো না···আমি তো আর কালা নই!

ইন্দো—তা হবি কেন? বালাই ষাট···বড় দেমাক হয়েছে, না? এই হামানদিস্তে দিয়ে তোর মুখ থেঁতো করে দেবো! আসুক না বাতোয়ালা বাড়ী ফিরে, আমি সব বলে দেবো··· লুকিয়ে বিসিবিংগুই-এর সঙ্গে মজা করা! আমি সব বলে দেবো···

ইয়াসী—বলি হঠাৎ এত রাগের কি হলো? ওহো-ওঃ··· বুঝেছি···বুঝেছি···অনেক বর্ষা একসঙ্গে কাটিয়েছি কিনা, তাই ভুলে গিয়েছিলাম যে তুমিও সেই নাংগাপৌ জাত থেকে এসেছো, তুমিও শাদা-চামড়ার ঘর করে এসেছো!

এরপর আর কথা-কাটাকাটি করার দরকার হয় না! আহত বাঘিনীর মতন ইন্দৌভৌরা ইয়াসীগুইন্দজার দিকে তেড়ে যায়। যদি তার সপত্নীরা মাঝপথে তাকে ধরে না ফেলতো, তাহলে হয়ত ইয়াসীগুইন্দজাকে সে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলতো। মনের ঝাল মেটাতে না পেরে যা-খুশী গালাগাল দিয়ে চলে। দরকার হলে সে কমাণ্ডারের কাছে গিয়ে নালিশ করবে। সকলকে ডেকে সে জানিয়ে দেবে, কি করে "ইয়ারো" খেয়ে সে পেটের ছেলে নষ্ট করে ফেলে, পঞ্চায়েৎ ডেকে সে গাঁয়ের বড়ো মোড়লদের কাছে তার বিচার দাবী করবে। বিসিবিংগুইকে নিয়ে ইয়াসীগুইন্দজা যা খুশী তাই করুক না কেন! বিসিবিংগুই-এর মতন লোককে সে এক কাণাকড়িও মূল্য দেয় না! যে বেটাছেলের গায়ে কাসিবি ঘা ভর্তি, কি দরকার তার সঙ্গে ওঠা-বসার?

ইন্দৌ—কথায় বলে না, পেট যার ভর্তি থাকে, সেই বলে আমার আর ক্ষিদে নেই!

স্থির কণ্ঠে ইয়াসাগুইন্দজা জবাব দেয়, বলি, হিংসে এমনি জিনিস! কই, আমার কাছ থেকে তুই যখন বিসিবিংগুইকে নিয়েছিলি, আমি কি তোর মতন চেঁচিয়েছিলাম?

ইন্দৌ—কেন, বিসিবিংগুই কি তোর সম্পত্তি নাকি? লোভ দেখ।

যেমন হঠাৎ ঝড় ওঠে, তেমনি হঠাৎ আবার থেমে যায়।

সপত্নীরা দু'পক্ষকেই থামিয়ে দেয়।

ইয়াসীগুইন্দজা হাসতে হাসতে বলে, খুব হলো, আর নয়! একদিনের পক্ষে খুব যথেষ্টই হলো। আয়, সবাই মিলে এখন খানিকটা গলায় ঢালা যাক্! শোবার মাদুর, পেটপুরে খাওয়া, খানিকটা বিয়ার, মিষ্টি পিঠে, নাচ-গান, আর হুঁকো ভর্তি তামাক—এ ছাড়া দুনিয়ায় চাইবার আর কি আছে?

সবাই মিলে হুল্লোড় করে ইয়াসীগুইন্দজার প্রস্তাবকে গ্রহণ করলো।

কয়েক মুহূর্ত আগে, সেখানে যে ঝড় বয়ে চলেছিল, তার কোন চিহ্নই রইলো না।

আবার সেই প্রতিদিনকার অভ্যস্ত জীবনের পরিচিত ধারা।

এমন সময় সহসা বাতাস বন্ধ হয়ে যায়। যেন শ্বাসরোধ হয়ে আসে। কোথা থেকে উড়ে আসে, ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি, মাছি...অফুরন্ত, অগণিত...সব জায়গা ছেয়ে ফেলে।

একটি একটি করে নিস্তব্ধ হয়ে আসে পাখীর দল। একটি একটি করে আকাশ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় শকুনিরা।

দেখতে দেখতে গাঁয়ের পেছন দিক থেকে প্রকাণ্ড মেঘের দল মাথা তুলে জেগে ওঠে। থাকের পর থাক জমা হতে হতে ক্রমশ তাদের রঙ বদ্‌লাতে সুরু করে। এলোমেলো ঝড় এসে তাদের আকাশময় টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দেয়। কি এক অদৃশ্য মায়াশক্তি তাদের নদীর দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসে।

ক্রমশ তাদের গতি স্পষ্ট দ্রুত হয়ে ওঠে ; সঙ্গে সঙ্গে রঙ বদলে কয়লার মত কালো হয়ে যায়। বনেতে আগুন লাগলে কালো বুনো ষাঁড়ের দল যেমন দিকবিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে আরম্ভ করে, তেমনি ধারা কি এক অজানা ভয়ের তাড়নায় তারা আকাশময় ছুটে বেড়ায়।

দেখতে দেখতে বিদ্যুৎ এসে তাদের ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে যায়। গুরু গুরু গর্জনে কেঁপে ওঠে আকাশ।

ঘরের বাইরে যে সব মাদুর আর হাঁড়িকুড়ি পড়েছিল, তাড়াতাড়ি সেগুলোকে ঘরের ভেতর তুলে আনা হয়। কুঁড়ে ঘরের ছাদের ভেতর দিয়ে নীল-নীল ধোঁয়া কিছুটা ওপরে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে, কিছুটা ঘরের বাইরে চারিদিকে অচল অনড় ঝুলে থাকে যেন।

থমথমে হয়ে আসে সব। বাম্বা, ডেলা, ডেকা, গ্রাম প্রান্তবর্তী ছোট ছোট নদীর ওপর নিথর স্থির দাঁড়িয়ে থাকে পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন কালো মেঘ। নিথর দাঁড়িয়ে থাকে তারা আফ্রিকার ছোট ছোট বুনো গাঁয়ের মাথার ওপর। মাটীর ওপর যা কিছু সবুজ, সেই কালো মেঘের ছায়ায় ক্রমশ সব হয়ে আসে গাঢ় ঘন। মেঘেতে ছোট হয়ে আসে দিন, অকস্মাৎ ছেদ পড়ে প্রতিদিনের জীবনে। মূর্তিমান ভয়ের মতন, গম্ভীর মুখে আকাশে অপেক্ষা করে থাকে মেঘের দল, আক্রমণের আদেশে যেমন অপেক্ষা করে থাকে সৈনিকরা...

কিছু দূরে ঐ সৌমানা গাঁ আর ইয়াকিজি গাঁয়ের মাঝখানে কে যেন ঝুলিয়ে দিল আকাশ থেকে মাটী পর্যন্ত পাতলা একটা আবছা পর্দা...বৃষ্টি...বৃষ্টি নেমেছে ওখানে।

হঠাৎ দূর অদৃশ্য লোক থেকে এক ঝলক তীব্র গরম হাওয়া ছুটে আসে...কলাগাছের পাতায় পাতায় সংঘর্ষ সুরু হয়ে যায়...চারদিক থেকে আবার ওঠে বিচিত্র সব ব্যাঙের আওয়াজ ...বৃষ্টিকে তারা ডাকছে।

দেখতে দেখতে চারদিক থেকে এলোমেলো বাতাস ফুলে ফেঁপে ছুটতে আরম্ভ করে। গাছ-পালা, লতা-গুল্ম, ভেঙ্গে ছিঁড়ে তছনছ ক'রে ফেলে ; গাঁয়ের পথের যত মেটে-ধূলো বাতাসের সঙ্গে মিশে আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলে ; এক নিমেষে সমস্ত অন্ধকার করে দিয়ে যেখান থেকে এসেছিল, তারা আবার সেখানে চলে যায় ! এরা দুর্বল। এরা শুধু জানিয়ে গেল, আসছে সে, যে মহাপ্রবল, প্রলয়ের রাজা।

আবার কিছুক্ষণের জন্যে সব নিস্তব্ধ হয়ে যায়। নিশ্চল, নিথর নিস্তব্ধতা।

তারপর সহসা বজ্রভেরী বাজিয়ে সুরু হয় বৃষ্টি। বাতাস ভরে যায় ভিজে মাটির মিষ্টি গন্ধে। আকাশ ছিঁড়ে নামে ঝড়ের মাতন। কাছে কোথাও বাজ পড়লো।

প্রত্যেক মুহূর্তের সঙ্গে সঙ্গে তীব্রতর হয়ে ওঠে ঝড়, তীরের মতন অবিরাম অজস্র ধারায় পড়ে বৃষ্টি। দেখতে দেখতে ঝড়ের

কশাঘাতে ক্ষেপে ওঠে শান্ত গ্রাম্য নদী। দুই তীর ছাপিয়ে নদীর জল কুল্ কুল্ রবে ছুটতে আরম্ভ করে গাঁয়ের দিকে। ডুবে যায় শস্যক্ষেত, প্রান্তর। অদৃশ্য হয়ে যায় লতা-গুল্ম। প্রমত্ত ঝড় একটি একটি করে, সমস্ত পাতা ছিঁড়ে উপড়ে ফেলে গাছ থেকে, ভেঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে যায় ঘরের চাল,···মাথায় হাত দিয়ে ছাদহীন ঘরে বসে বসে ভেজে গৃহস্থরা, নিভে যায় উনুন, ভেঙ্গে পড়ে মাটির দেয়াল, এক হয়ে যায় নদ-নদী, মাঠ আর ঘাট, ঘর আর উঠান; কুকুর, মুরগী, ছাগল, মানুষ, একই অবস্থায় একই ভাবে ঝড়ের নির্দয় খেলার পুতুল হয়ে বসে থাকে।

সারাদিন, সারা রাত ধ'রে সমানে চল্‌লো সেই ঝড় আর বৃষ্টি। তার পরের দিন দুপুর পর্যন্ত···

তখন একটু একটু ক'রে ঝড়ের বেগ কমে আসে। কিন্তু বৃষ্টি থামে না। তবে তারও মাত্রা কমে আসে। ঝির ঝির করে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি সমানে তখনও ঝরতে থাকে।

মাঠে আর মাটিতে চারিদিকে ছিল যে-সব উঁচু-নীচু রেখা, অথই জলের মধ্যে ডুবে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় সব। আনন্দে গান গেয়ে ওঠে শুধু ব্যাঙের দল। রীতিমত কোরাস্।

সন্ধ্যের দিকে বৃষ্টি থেমে আসে। যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ আবার থেমে যায়। কখন যে গোধূলি এলো গেল, তা কেউ জানতে পারে না। একেবারে নেমে আসে রাত্রির অন্ধকার।

বাতোয়ালা গালে হাত দিয়ে ভাবে, সামনের গান্‌জার উৎসব তবে কি এইরকম বৃষ্টির জলে ভেসে যাবে ?

দেখতে দেখতে আকাশে ভাঙ্গা চাঁদ পুরো হয়ে এলো। এলো উৎসবের রাত। গান্‌জার উৎসব সুরু হয়ে গেল।

বরাৎ ভাল, হপ্তাখানেক হল গ্রিমারী* ছেড়ে কমাণ্ডার বাইরে চলে গিয়েছে। বাড়ী থেকে বেড়াল দূর না হলে, ইঁদুররা নিশ্চিন্তে কি করে খেলতে বেরোয় ? বামুন গেল ঘর, তো লাঙ্গল তুলে ধর ! তাই তারা সবাই ছুটলো কমাণ্ডারের অফিসের সামনের মাঠে। সারা গাঁয়ের মধ্যে এমন সুন্দর আর এত বড় খোলা জায়গা আর একটিও নেই। গান্‌জার সময় যে যুদ্ধের নাচ হবে, এমনি বড় জায়গা না পেলে কি করে তা হবে ?

কমাণ্ডারের বাংলো থেকে বাম্বার তীর পর্যন্ত এই মাঠ চলে গিয়েছে। কমাণ্ডারের বাংলোর পাশেই তাঁর অফিস, সামরিক তাঁবু আর ফাঁড়ি। রক্ষী হিসাবে আছে মাত্র একজন সৈনিক, বুড়ো বৌলা। বৌলা মাইডিয়ার লোক, তাকে ভয় করবার কিছুই নেই।

পুরো দমে চলে উৎসবের আয়োজন। নাচের সঙ্গীতের জন্যে পর পর বারোটা জায়গায় বারোটা লিংঘা বসানো হয়েছে।

*বাতোয়ালাদের গাঁয়ের নাম, স্থানীয় ফরাসী শাসনকর্তার হেড-কোয়ার্টার।

পুরানো পোকায় কাটা যন্ত্র নয়···গান্জার জন্যে তৈরী নতুন বাদ্য-যন্ত্র···কাদা আর ময়দা আর রঙ গুলিয়ে প্রত্যেকটিকে চিত্র-বিচিত্র করা হয়েছে।

মাঠের একধারে নানারকমের সব খাদ্য ঝুড়ির পর ঝুড়ি সাজিয়ে রাখা হলো—কোন ঝুড়িতে ভুট্টার খই, কোনটাতে সবজীর পিঠে, কাঁদি কাঁদি কলা, বুনো টমাটো, বড় বড় মাটির ডিস ভর্তি শুঁয়ো পোকা, ডিম, মাছ। আগে থাকতেই চাঁই চাঁই হরিণ আর হাতীর মাংস রোদে শুকিয়ে আর আগুনে পুড়িয়ে তৈরী করে রাখা হয়েছিল। বুনো ষাঁড়ের আস্তো ঠ্যাং আগুনে সেঁকে ঝুলিয়ে রাখা হলো। সেই সঙ্গে মজুত রইলো ঝুড়ি ঝুড়ি নানা রকমের বুনো আলু, শাদা চামড়াওয়ালারা এ-সব আলু মুখে তোলে না! তার স্বাদ জানবে কি করে! একপাশে বড় বড় মাটির কলসীতে মুখ পর্যন্ত ভর্তি করে রাখা হলো তাদের নিজের হাতে চোলাই-করা মদ। আয়োজনকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে বাতোয়ালা কয়েক বোতল বিদেশী মদও জোগাড় করে রাখতে ভুললো না। অবশ্য, সে-বোতলগুলো মজুত রইলো শুধু বড় বড় সর্দার আর পঞ্চায়েতের মাথাদের জন্যে। আয়োজন দেখে সবাই বুঝলো, গান্জা জমবে ভাল।

মাঠের চারদিক থেকে কাঁচা কাঠের আগুনের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠতে থাকে। সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী লক্ষ্য করে দূর দুরান্ত গাঁ থেকে তারা আসতে আরম্ভ করে ছেলে, বুড়ো, যুব,

যুবতী, কুলী, মজুর, এমন কি তাদের সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের কুকুরগুলোও পিছু পিছু চলে।

তাদের "কাগা" ছেড়ে, জঙ্গল ছেড়ে, বুনো জলা ছেড়ে, দলে দলে তারা আসতে আরম্ভ করে···তারা আসছেই আসছে··· হাতে বর্শা, পিঠে ধনুক···দলের মোড়লদের হাতে একটা করে জ্বলন্ত কাঠ···বনের অন্ধকারে সেই জ্বলন্ত কাঠের মশালে পথ দেখে দেখে তারা এগিয়ে চলে···

মেয়েরা এসেই ভোজের আয়োজনে যোগদান করে। বড় বড় কাঠের জাঁতায় তারা গম আর বুনো ভুট্টা পিষতে সুরু করে দেয়। পেষবার সঙ্গে সঙ্গে তারা সবাই মিলে সুরু করে দেয় গান।

এক এক কলি গান শেষ হয় আর হাসির হর্‌রা ওঠে। হাসতে হয় বলে তারা হাসে। কথা বলতে হবে বলে তারা কথা বলে, তা সে কথার কোন মানে থাক আর নাই থাক। ক্রমশ তাদের হাসি আর কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, চোলাইকরা 'কেনে'র কাজ সুরু হয়ে গিয়েছে। যে যখন পাড়ছে, ভাঁড় ভর্তি করে গলায় ঢালছে।

দেখতে দেখতে মাঠ ভরাট হয়ে ওঠে। ম্‌বিসেরা এসেছে, নাংগাপুরা এসেছে, ডাকারা এসেছে, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে এসেছে তাদের মোড়লরা।

সর্দাররা মাঠের মাঝখানে একটা জায়গায় গোল হয়ে সকলে

একসঙ্গে বসেছে। বাতোয়ালার বুড়ো মা-বাপ সর্দারদের সঙ্গেই বসেছে।

কথাবার্তা হচ্ছে…

বাংগুইতে নাকি কারা জনকয়েক শাদা লোককে মেরে ফেলেছে…

গভর্ণর সেইজন্যে শিগগিরই বান্‌ডোরোতে যাবে…

ফ্রান্সে কোথায় নাকি ম্‌-পুতু বলে জায়গা আছে, সেখানে শাদা জার্মাণদের সঙ্গে তাদের শাদা মনিবদের লড়াই হচ্ছে…

কথার সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে হাতে হুঁকো চলে…কোন কল্‌কেতে গাঁজা…কোন কল্‌কেতে তামাক…

হুঁকোতে বেশ ভাল করে গোটাকতক টান দিয়ে পাঙ্গাকৌরা বলে ওঠে, শুনছো বাতোয়ালা তোমাকে একটা কথা বলি শোন! এই আমি বাইরে ক্রেবেজি শহর থেকে ঘুরে আসছি! বাইরে ঘুরে বেড়ালে অনেক নতুন জিনিস শেখা যায়। তোমরা ভাব, শাদা লোকগুলো বুঝি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে না…আরে ছোঃ! মোটেই তা নয়। শোন, একটা ব্যাপার বলি,—নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

…একজন পর্তুগীজের বিরুদ্ধে আমার নিজের নালিশ নিয়ে কমাণ্ডারের সঙ্গে দেখা করি। কমাণ্ডারকে আমরা নাম দিয়েছি কেতোয়া, জালার মতন এই বড় তার পেট! কমাণ্ডারকে আমার অভিযোগের কথা জানালাম, অবিশ্যি একটু আধটু এ-দিক ও-দিক

করেই বলতে হলো। মনে মনে ভাবছি, হাজার হোক পর্তুগীজরা হলো শাদা চামড়া, আমার কথা কি কমাণ্ডার শুনবে? আরে, শোন ব্যাপার, কমাণ্ডার কি বল্লো জানো?" আমাকে ডেকে বললো, পাঙ্গাকৌরা, তুমি হচ্ছো যাকে বলে অপদার্থের অপদার্থ! তোমার মত মূর্খ আমি আর একটিও দেখিনি! তুমি কি জান না যে, পুর্ত্রিকিস্‌দের আমরা থোড়াই কেয়ার করি? পুর্ত্রিকিস্ আবার মানুষ নাকি! শোন তাহলে বলি। শাদা লোকদের যিনি ভগবান, তিনি যখন মানুষ তৈরী করতে বসলেন, তখন হাতের কাছে যত সব ভাল জিনিস পেলেন তাই দিয়ে তিনি আমাদের তৈরী করলেন। সমস্ত ভাল জিনিস যখন ফুরিয়ে গেল, তখন যে-সব ময়লা আর নোংরা জিনিস পড়েছিল, তাই দিয়ে তখন তোমাদের মতন ডার্টি নিগারদের তৈরী করলেন। এইভাবে ভালমন্দ সব জিনিসই যখন ফুরিয়ে গেল, তখন ভগবানের নজর পড়লো এই পুর্ত্রিকীসদের তৈরী করার ওপর! তখন আর কি দিয়ে তৈরী করবেন? অগত্যা নিগ্রোদের পরিত্যক্ত মল-মূত্র থেকে তিনি পুর্ত্রিকীস্‌দের তৈরী করলেন। বুঝলে এখন?"

পাঙ্গাকৌরার অভিজ্ঞতার গল্পে সবাই অট্টহাস্য করে ওঠে।

বাতোয়ালা জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা, রবারের দাম যে এই রকম পড়ে গিয়েছে, তাতে কি মনে কর, আমাদের কোন সুবিধে হবে?

পাঙ্গাকৌরা বলে, তার জন্যেই তো আজ আমরা নিশ্চিন্তে এই উৎসবে জমায়েৎ হতে পেরেছি। শাদা লোকগুলো সব ছুটছে রবার কিনতে। আমাদের কিনতে হলে যেখানে পাঁচ ফ্রাঙ্ক দিতে হয় সেখানে শাদা লোকগুলো তার দশ ভাগেরও কম দাম দেয়।

ইয়াকিজী বলে ওঠে, তুমি ঠিক করেছো বাতোয়ালা! বাধ্য হয়েই এখন ব্যবসায়ী বেটারা সব ক্রেবেজীতে গিয়ে ধন্না দিয়েছে!

কে একজন বলে ওঠে, ব্যাটারা কবে মরবে? বুক পর্যন্ত কাদায় ডুবে, মুখ হাঁ করে কবে মরবে বেটারা?

কে একজন উত্তর দিয়ে ওঠে, তার জন্যে ভাবনা কি! দেখছো না, বন্দুকওয়ালা শাদা সেপাইগুলো জাহাজ ভর্তি হয়ে যাচ্ছে···শাদা জার্মাণদের সঙ্গে আমাদের শাদা মনিবদের বোধ হয় ঝগড়া বেঁধে গিয়েছে!

—হাঁ, হাঁ···যত বেটা বুলেটওয়ালা, দেখছো না চলে যাচ্ছে। ওদের দেশের ম্-পুতু শহরে যুদ্ধ হচ্ছে!

—বোধহয়, আমাদের এখানকার কর্তাদেরও যেতে হবে।

বাতোয়ালার বৃদ্ধ পিতা সায় দিয়ে ওঠে, ইয়াবায়ো! আমাদের এই গাঁ আর নদী যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি হবে তোমার কথা!

একজন বৃদ্ধ সর্দার প্রতিবাদ করে ওঠে,—এখানকার ফ্রেঞ্চ-

গুলোকে দেখলে কি মনে হয় যে তারা এদেশ ছেড়ে চলে যাবে? মোটেই না! আরে, সেখানে গেলে বিপদ আছে! কেন সেখানে এরা মরতে যাবে? নিজের চামড়া সবাই বাঁচাতে চেষ্টা করে?

তার কথায় সবাই আবার হেসে ওঠে।

—ঠিক বলেছ বুড়ো সর্দার! তোমার কথা মিথ্যে হয় না। কিন্তু আমার কি ইচ্ছে জানো? জার্মাণরা যেন এই ফ্রেঞ্চদের বেশ করে হারিয়ে দিতে পারে! বেশ উত্তম-মধ্যম দেয়!

বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তুমি তো বলছো বটে ইয়াবাদা, কিন্তু জার্মাণই হোক আর ফ্রেঞ্চই হোক, তারা সবাই সাদা! তাহলে, একজনের বদলে আর একজনকে চেয়ে কি লাভ? আমরা ফরাসীদের পায়ের তলায় পড়ে আছি। একটা সুবিধে, অনেকদিন একসঙ্গে থেকে তাদের ভালটা যেমন জানি, তাদের মন্দটাও তেমনি। নিয়ূ যেমন ইঁদুর নিয়ে খেলা করে, তারা আমাদের নিয়ে তেমনি খেলা করবেই!

ইয়াবাদা জবাব দেয়, শুধু খেলা করতে তো কিছু যায় আসে না। নিয়ূর খেলা যে বড় সাংঘাতিক, খেলার পরিণাম হল, খেয়ে ফেলা, নিয়ূ ইঁদুর নিয়ে খেলতে খেলতে ইঁদুরকে খেয়ে ফেলে।

বৃদ্ধ হেসে বলে, সুতরাং আমাদের যখন খেয়েই ফেলবে, মরতেই যখন আমাদের হবে, তখন যে-নিয়ূ আছে, তার বদলে নতুন নিয়ূ এলে আমাদের কিছুই লাভ হবে না।

অন্য আর একজন সমর্থন করে,—বুনো ষাঁড়ের শিং থেকে ক্ষেপা নেকড়ের মুখে গিয়ে পড়া !

সকলেই বৃদ্ধকে সমর্থন করে ওঠে।

—"বুড়ো সর্দার ঠিকই বলেছে। মনিব বদল করে কি লাভ ? বদলে যে মনিব আসবে, সে হয়ত আরো খারাপ হবে !

সকলেই আলোচনায় যোগদান করে।

"—ওরা আমাদের একটুও ভালবাসে না।"

—ওরা যেমন আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করে, আমরাও ঠিক সেইরকম করবো !

—ওদের খুন করে মেরে ফেলা উচিত !

—ঠিক বলেছো !

—একদিন, আজ না হোক, দুদিন পরে, আমরা—

—হাঁ, আমরা, বান্‌জিরি, ইয়াকোহামা, গৌবু, সাংবা, ডাক্‌বা বিভিন্ন সম্প্রদায়, নিজেদের মধ্যে পুরানো ঝগড়া, দলদলি আর রেষারেষি ছেড়ে দিয়ে, সকলে মিলে যখন এক হব···তখন···

এই ক্রমবর্ধমান উচ্ছ্বাসের স্রোতে বাধা দিয়ে একজন বলে ওঠে, তখন বাম্বা উল্‌টো দিকে···তার আগে আর আমরা এক হতে পারবো না···

তাকে সমর্থন করে আর একজন বলে ওঠে, তখন মাছ-ধরার হাঁড়িতে মাছের বদলে আকাশের চাঁদ ধরা পড়বে !

সকলে আবার হেসে ওঠে। এবং এতক্ষণ ধরে সবাই মিলে

এতই হাসতে থাকে যে, দূরের একটা আওয়াজ তাদের কানেই এসে পৌঁছয় না।

বাতোয়ালা তখন 'কেনে'তে টই-টুম্বুর। নেশায় দুই চোখ লাল হয়ে উঠেছে। উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে ওঠে, হয়, তোমরা সবাই কুকুরের বাচ্ছা, না হয়, তোমরা আমার চেয়ে ঢের বেশী মদ খেয়েছো। আমি জানতে চাই, তোমরা মানুষ কি না ? মানুষের বাচ্ছা কি না ? তোমাদের ছেলেবেলায় কি দেবতার নামে ওঝারা তোমাদের লিঙ্গচ্ছেদ করে নি ? আলবৎ করেছে ! তবে ? আমার কথা হচ্ছে, আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, শাদা চামড়াকে কিছুতেই ভুলবো না !

নেশার প্রেরণায় বাতোয়ালার মনের বাঁধন খুলে যায়। সে বলতে সুরু করে,—আমার মনে আছে, একদিন নিউবাংগুই নদীর ধারে, বেসোকেমো আর কেমো-আউদার মাঝখানে বিরাট জায়গায় ম্-বিস্‌রা কি সুখে, কি শান্তিতে বাস করতো··· তারপর যেই এল শাদা লোকগুলো, অমনি ঘর-বাড়ী ছেড়ে, বাপ-পিতামোহের ভিটে ছেড়ে দলে দলে আমাদের সরে পালিয়ে আসতে হল ; সঙ্গে মুরগী, ছাগল, হাঁড়ি-কুঁড়ি, ঠাকুর-দেবতা, ছেলেপুলে, স্ত্রীলোক সব নিয়ে পালিয়ে আসতে হল। হাঁ, আমার স্পষ্ট মনে আছে···যদিও তখন আমি বালক মাত্র।

আমরা সরে এসে ক্রেবেজ শহরের আশে-পাশে এসে বসলাম। কিন্তু সেখানেও এলো বাধা। অনেক হলো লড়াই।

তারি মধ্যে নতুন করে ঘর বেঁধে, মাটি চষে বেঁচে রইলাম কোন রকমে কিন্তু শেষকালে ক্রেবেজও নিয়ে নিল শাদারা।

আবার সেখান থেকে সরতে হলো! হাঁটতে হাঁটতে গ্রিকো-তে এসে পৌঁছলাম। পছন্দ হলো জায়গাটা। গ্রিকোতেই আবার ঘর বাঁধলাম। কম হাঙ্গামা? সেই নতুন করে আবার সব গড়তে হলো।

ভাবলাম, এবার হয়ত শান্তিতে থাকতে পারবো। হায়, তা কি হয়? সেখানেও তারা ঘাড়ে এসে পড়লো···মার, ধোর, আগুন, গুলী···

আবার, তল্পি-তল্পা নিয়ে পালাতে হলো···

গ্রিমারি! অবশেষে গ্রিমারীতে এসে পৌঁছলাম। বাম্বা আর পোম্বার মাঝখানে একটা ভাল জায়গা দেখে আবার ঘর-বাড়ী তুল্লাম···

ঘর-বাড়ী তৈরী শেষ হতে না হতেই এখানেও ঘাড়ে এসে পড়লো নেকড়ের দল···

আর কতক্ষণ যোঝা যায়! মন ভেঙ্গে পড়েছে সকলের। একটু একটু করে জাতের অধিকাংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার মতন হয়েছে। তাই, আর গ্রিমারি থেকে নড়তে পারলাম না··· শাদা চামড়ার শাসন মেনে নিয়ে এখানেই পড়ে রইলাম ··যতদূর পারা যায়, তাদের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলতে হচ্ছে···নইলে জাতটা যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়!

দূরে যে শব্দ হাসির মধ্যে শোনা যায় নি, ক্রমশ সেটা যেন আরো কাছে আসতে থাকে।

"কিন্তু আমরা যে এই বশ্যতা স্বীকার করে নিলাম, তাতে কি তারা আমাদের ওপর খুশী হলো? তাদের মন পেলাম না তাতেও। আমাদের আচার-অনুষ্ঠান তো সব বন্ধই করে দিয়েছে, বাপ-পিতামোর আচার-অনুষ্ঠান! কিন্তু তাতেও তারা সন্তুষ্ট নয়, তারা চায় তাদের আচার-অনুষ্ঠান আমাদের ঘাড়ে চাপাতে! যখন খুশী যা আদেশ দেবে, তা মানতেই হবে। হুকুম হলো টাকা-পয়সা নিয়ে "পাতারা" খেলতে পারবে না! আমাদের নাচ-গান শুনলে তারা চটে যায়, তাদের সামনে নাচ-গান চলবে না! তবে, হাঁ, যদি পয়সা দিই, তা হলে তারা অনুমতি দিতে পারে! অতএব, পয়সা দাও! অনবরত, খাজনা দাও, আর খাজনা দাও! তাদের সিন্দুক ভর্তি আর হয় না।

যদি এই হতভাগা শাদা জাতের লোকগুলোর মধ্যে কোন মতিস্থির থাকতো কিম্বা তাদের কথাবাতার মধ্যে কোন বিচার-বুদ্ধি থাকতো, তা হলে না হয় কোন রকমে তাদের মেনে চলা যেতো। কিন্তু তাদের কথাবার্তা কিম্বা কাজ-কর্মের মধ্যে কোন সঙ্গতিই নেই। এই তো দু' চাঁদ আগেকার ঘটনা, ঐ বুনো জানোয়ার, ওরো, মদ খেয়ে নেশা করে তার ইয়াসীটাকে কুকুর-ঠেঙ্গানো ঠাঙ্গালো, এমন মার মারলে যে মেয়েটা হাড়-গোড় ভেঙ্গে তাল হয়ে পড়ে রইলো!

কিন্তু সেটা এমন কি একটা সর্বনেশে কাণ্ড? আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে বলতে পারে, তার ইয়াসীকে কখনো মারে নি?

বোকা মেয়েটা সোজা গিয়ে কমাণ্ডারের কাছে নালিশ করে দিলো। তখন হবি তো হ', কমাণ্ডার তার শাদা বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলো। সাধারণত লোকটা ঠাণ্ডা মেজাজেরই লোক কিন্তু সেদিন কি যে হলো, ভীষণ রেগে গেল। একজন দেশী পুলিশকে ডেকে হুকুম দিলো, তক্ষুণি ঔরোকে ধরে নিয়ে কারাগারে বেঁধে রাখতে। লোকটা হুকুম তামিল করতে একটু ইতস্তত করে, তাই না দেখে, কমাণ্ডার তার হাতের কাছের একটা খালি মদের বোতল তুলে সোজা তার মাথায় বসিয়ে দিলো। ব্যাপার দেখ! মাথা ফেটে চাপ চাপ রক্ত বেরুলো, লোকটা বেহুঁস হয়ে সেইখানেই পড়ে গেল। আর তাই না দেখে, শাদা লোকগুলো হেসে কুটি-কুটি, যেন কি মজাই না হয়ে গেল!

এই তো ব্যাপার, ওদের কাছ থেকে আমরা সব বিষয়েই এইরকম ব্যবহার পেয়ে আসছি। আমার কথা যে কতখানি সত্যি, তা যদি নিজের চোখে দেখতে চাও ইয়াবাদা, তা হলে কমাণ্ডার যাতে দেখতে পায়, এমনি কোন জায়গায় বসে 'পাতারা' খেলায় তুমি দুটো ফ্রাঙ্ক ফেলে দেখ···তা হলেই দেখতে পাবে··· খুব কম শাস্তি যদি হয়, তা হলে হাতে-পায়ে বেড়ী! জুয়ো খেলবে শুধু শাদা চামড়ার লোকেরা···"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাতোয়ালার চোখ নেশায় লাল হয়েই ছিল, তার ওপর উত্তেজনায় মনে হয় যেন এখুনি রক্ত ফেটে পড়বে। রাগে কথা জড়িয়ে আসে তবুও জোর গলায় সবাইকে ডেকে বলে ওঠে···,

"শাদা চামড়ারা অপদার্থ···আমাদের জন্যে এতটুকু দরদ তাদের নেই···তারা মনে করে আমরা সবাই মিথ্যুক···হাঁ, আমরা মিথ্যে কথা বলি কিন্তু আমাদের সেই মিথ্যে কারুর ক্ষতি করে না, কাউকে সর্বস্বান্ত না। কালে-ভদ্রে সত্যিকে একটু বাড়িয়ে বলতে হয়···তার জন্যে দু-চারটে মিথ্যে বলতে হয়, নইলে সত্যির স্বাদ থাকে না, ঝোলে নুন না দিলে কি ঝোলের কোন স্বাদ থাকে?"

"কিন্তু শাদা চামড়ারা তো সেজন্যে মিথ্যে বলে না···তারা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে মিথ্যে বলে···তাদের সব মিথ্যে হলো ভেবে-চিন্তে তৈরী-করা জিনিস···তাদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে···"

"তাই তারা সব ব্যাপারে আমাদের ওপর টেক্কা দিতে পারে।"

"ওরা বলে, আমরা নিগার পরস্পর পরস্পরকে ঘেন্না করি, নিজেদের মধ্যে মারামারি করি···আর ওরা? ওদের কমাণ্ডার-গুলো আর ওদের বন্দুকওয়ালারা সব সময় গলা জড়াজড়ি করে থাকে নাকি? ওদের মধ্যে ওরা মারামারি করে না? আমরাই বা ওদের মতন করতে পারবো না কেন? গায়ের চামড়ার রঙ

আলাদা হলে বুঝি মানুষ আলাদা হয়ে যায় ? গায়ের চামড়ার রঙ যাই হোক না কেন, আমরা সবাই মানুষ না ?

দূর থেকে যে অস্পষ্ট আওয়াজটা আসছিল, সেটা যেন আরো কাছে এসে পড়ে···মেঘের গুর্ গুর্ আওয়াজের মতন শোনায়···

বাতোয়ালা হাত-মুখ নেড়ে বলে চলে, "শাদা লোকগুলোর শয়তানীর কথা জীবন থাকতে ভুলবো না···বিশেষ করে তাদের ছলনা···তারা একরকম কথা বলে, আর একরকম কাজ করে। তারা কত না কথা আমাদের শুনিয়েছিল ? বলেছিল, আমরা একদিন বুঝতে পারবো আমাদের ভালর জন্যেই তারা আমাদের খাটাচ্ছে···গতর দিয়ে খেটে যে-টাকা আমরা রোজগার করছি, সে টাকা নাকি তারা রেখে দিচ্ছে, আমাদের জন্যে ভাল ভাল রাস্তা, বড় বড় সাঁকো তৈরী করবে বলে, আমাদের জন্যে তারা লাইনের-ওপর-দিয়ে-চলা গাড়ী তৈরী করে দেবে, আশ্চর্য গাড়ী, আগুনের আঁচে নাকি যন্তরে চলে ! কত আশার কথাই না তারা বলেছিল। কোথায় সে-সব রাস্তা কোথায় সে-সব সাঁকো ? আর কোথায় বা সেই যন্তরে-চলা আশ্চর্য গাড়ী ? মাতা ! নি নি ! কিছু না, কিছু না ! সব ফাঁকি ! এই অজুহাতে আমাদের যথাসর্বস্ব তারা চুরি করে নিচ্ছে. আমরা যা রোজগার করি, তার ক' ছিদেম আমরা ঘরে রাখতে পাই ? তোমরাই বলনা, আমাদের আর কি আছে ? দুর্ভাগ্য ছাড়া আমাদের আর কি আছে ?

"জলের দরে ওরা আমাদের কাছ থেকে রবার কেনে। আজ তিরিশ চাঁদ হয়ে গেল, সেই তিন ফ্রাঙ্কে এক কিলো রবার তারা কিনে চলেছে—আর প্রত্যেক চাঁদে ট্যাক্‌স্ বেড়েই চলেছে —এই সেদিন বলা নেই, কওয়া নেই, কেন তা কেউ জানলো না, বাজার দর কমে একেবারে নেমে গেল—আর ঠিক সেই তালে আমাদের গভর্ণর পাঁচ ফ্রাঙ্ক থেকে ট্যাক্‌স্ বাড়িয়ে একেবারে দশ ফ্রাঙ্ক করে দিলো—

"আমরা শুধু হলাম একতাল মাংস, যা নিংড়ে ট্যাক্‌স্ আদায় করা যায়···আমরা হলাম শুধু পশু. ওদের মোট বইবার জন্যে! তার চেয়েও জঘন্য, আমরা হলাম কুকুর! স্রেফ রাস্তার কুকুর! কুকুর আর ঘোড়াকে ওরা যে আদর করে, যত্ন করে, আমরা তার শতভাগের একভাগও পাই না—আমরা শুধু পশু নই, পশুর পশু—তাই একটু একটু করে ওরা আমাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলছে—

বাতোয়ালা আর বুড়ো সর্দাররা যেখানে বসেছিল, পেছন থেকে একদল লোক সেই দিকে ঠেলে আসতে সুরু করে দিল। সুরার উত্তাপে তাদের খালি গা দিয়ে তখন দরধারায় ঘাম ঝরে পড়ছে।

বাতোয়ালার বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে ব্যর্থ-আক্রোশের অভিশাপ-বাণী জেগে উঠলো। কেউ কেউ বাতোয়ালাকে সাবাস্ দিয়ে উঠলো, ঠিক বলেছো, বিলকুল ঠিক!

যখন শাদা লোকগুলো এ-দেশেতে পা দেয় নি, তখন তারা কেমন সুখে ছিল। এমন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হতো না—দরকার মত একটুখানি খাটলেই চলে যেতো, তারপর খাও, দাও, স্ফূর্তি করো, ঘুমোও। মাঝে মাঝে কখনো কখনো লড়াই কাজিয়া করতে হতো। কিন্তু তাতে লাভ ছাড়া লোকসান ছিল না। আজও মনে পড়ে, তখন কি ধূম পড়ে যেতো নিহত শত্রুর দেহ ছিঁড়ে লিভার খাবার জন্যে, সবাই ছুটতো তার অংশের জন্যে, কেননা, শত্রুর যা কিছু সাহস তার লিভারের সঙ্গেই থাকে, তাই সেই কাঁচা লিভার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা সাহসও দেহের ভেতর রক্তের সঙ্গে মিশে যেতো···সে ছিল অতীত যুগের কথা, যখন শাদা লোকগুলো এদেশের মাটিতে পা দেয় নি।

আজ তারা শুধু ক্রীতদাস ; তারা বুঝে নিয়েছে ঐ হৃদয়হীন শাদা জাতের কাছ থেকে তাদের আশা করবার কিছু নেই। শাদা লোকগুলো তাদের ঘরের মেয়েদের জোর করে দখল করে, ভোগ করে, আর তার ফলে, তাদের নিজেদের মধ্যেই বিভেদের সৃষ্টি হয়। তাদের ভোগ মিটে গেলে শাদা লোকগুলো তাদের কালো মেয়েমানুষগুলোকে পরিত্যাগ করে, তাদের গর্ভে যেসব ছেলেমেয়ে হয়, তাদের স্বীকার করে না। আর এই সব বেজন্মা ছেলেমেয়ে বড় হয়ে নিজেদের জাত-ভাইদেরই ঘৃণা করতে শেখে, তাদের বাপের শাদা চামড়া ছিল, এই গর্বে তারা নিজেদের

স্বজাতের সঙ্গে মেশে না। এইভাবে এই বেজন্মাগুলো সমাজের ভেতরে থেকে সমাজের পাপই বাড়িয়ে চলে, সবাইকে তারা ঘৃণা করে, হিংসা করে, তাদেরকেও সবাই তেমনি ঘৃণার চোখে দেখে। আল্‌সে, কুঁড়ে, বদমায়েস, এই বেজন্মাগুলো শুধু ব্যভিচারকেই বাড়িয়ে চলে।

বাতোয়ালার দম তখনো ফুরোয় নি।

সে আবার উঠে বলতে আরম্ভ করে, আর শাদা লোকগুলোর সঙ্গে যেসব শাদা চামড়াওয়ালা স্ত্রীলোকগুলো থাকে, তাদের কথা না বলাই ভাল। প্রথম-প্রথম আমরা মনে করতাম, তারা বুঝি একটা আলাদা জাতের মানুষ, আশ্চর্য কোন সৃষ্টি! দেবতার মতন তাই দূর থেকে তাদের ভয় করতাম, সম্মান দিতাম। আজ সে ভুল আমাদের ভেঙ্গে গিয়েছে! কালো নিগ্রো মেয়েকে যত সহজে পাওয়া যায়, তার চেয়ে সহজে পাওয়া যায় ঐ শাদা চামড়াওয়ালা স্ত্রীলোকগুলোকে…আমাদের মেয়েদের চেয়ে ঢের বেশী কামুক ওরা! তাদের যে-সব দোষ আছে, আমাদের কালো মেয়েদের তা নেই…কালো মেয়েরা তা জানে না পর্যন্ত! তবু… শাদা চামড়াওয়ালীরা চায়, আমরা সব সময় তাদের সমীহ করে চলি…"

বাতোয়ালার বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বাবা হাত তুলে ইঙ্গিত করতেই সব গোলমাল থেমে গেল, বুড়োর কথা শোনবার জন্যে সবাই একেবারে চুপ হয়ে গেলো। সেই

নিস্তব্ধতার ভেতর থেকে শুধু শোনা যাচ্ছিল, সেই দূর থেকে ভেসে আসা আওয়াজ।

বুড়ো বলতে সুরু করলো,

"তোরা যা বল্লি, তা সবিই সত্যি! তবে সেই সঙ্গে এইটে শুধু মনে রাখতে হবে, আমাদের করবার কিছু নেই। কাজেই ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দাও! যখন বনের ভেতর "বামারা" গর্জে ওঠে, তখন তার কাছে কোন হরিণই যায় না, যাওয়া উচিত নয়। আজ আর তোমরা বলশালী নও। তোমাদের চেয়ে ওরা ঢের বলশালী। তাই, চুপ করে সহ্য করে যাও!

"তাছাড়া আজকে আমরা এখানে ওদের গালাগাল দেবার জন্যে জড় হই নি। আমার বয়স হয়েছে, বুড়ো হয়ে গিয়েছি, তাই গালাগালের উত্তেজনায় আমারও জিভ্ আল্‌গা হয়ে গিয়েছিল। তাই, বলচি একটু কম চেঁচিয়ে, গলায় ঢালো বেশী। শাদা লোকগুলো কাঠের বিছানা আর কাঠের লম্বা লম্বা চেয়ার-ছাড়া আর যত কিছু জিনিস তৈরী করেছে, তার মধ্যে সেরা হলো, তাদের তৈরী মদ!

"অবশ্য, আমার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে, কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে আমি সামনে কতকগুলো আবসাঁথের বোতল দেখতে পাচ্ছি। বাতোয়ালা, বোতলগুলো খুলবে নাকি?"

বাতোয়ালার বক্তৃতায় যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, বুড়োর

কথায় তা নিভে গেল। আবার উৎসবের আনন্দে সবাই প্রাণ খুলে হেসে উঠলো। বাতোয়ালা বৃদ্ধ পিতার ঝাপসা দৃষ্টিশক্তির তারিফ করতে করতে আব্সাঁথের বোতলগুলো এগিয়ে দিলো।

দূরের শব্দ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনে হয়, তাদের গাঁয়ের কাছ-বরাবর আওয়াজটা এগিয়ে আসছে। আরো কাছে এগিয়ে আসছে। পোয়াবা আর পাঙ্গাকৌরার রাস্তার মোড়ে যেন এসে পড়েছে। ক্রমশ আরো কাছে এগিয়ে আসছে, কমাণ্ডারের আস্তাবল যেখানে আছে, সেখান থেকে যেন শব্দটা আসছে। এইবার যেন বাম্বার পোল পেরিয়ে শব্দটা আরো কাছে এগিয়ে আসছে…এই দিকেই আসছে…

এবারে আর শব্দ নয়।

শব্দ মূর্তি ধরে সামনে এগিয়ে আসে। একদল তরুণ-তরুণী নাচতে নাচতে আর গাইতে গাইতে উৎসব-প্রাঙ্গণের দিকে এগিয়ে আসে।

তাদের সর্বাঙ্গ নগ্ন। নগ্ন গা পা থেকে মুখ পর্যন্ত ভস্মের প্রলেপে শাদা করা হয়েছে। এই হলো তাদের রীতি, ধর্মের অনুশাসন।

একদল গাইছে, আর তার তালে তালে আর একদল নাচছে। তারা সচরাচর যে ভাষায় কথা বলে, এই গানের ভাষা কিন্তু তা নয়। একটা বিচিত্র অনুনাসিক শব্দের মালা, কখনও বা গলার ভেতর থেকে নানা রকমের আওয়াজ বেরিয়ে

আসছে। এই ভাষার নাম হলো শামালী, তাদের ধর্ম-কর্মের ভাষা। নাচতে নাচতে তারা যেন ভাবাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

তাদের দেখতে পেয়ে উৎসব-প্রাঙ্গণের বিরাট জনতা সমস্বরে এক বিপুল আওয়াজে অভিনন্দন করে উঠলো। সে বিপুল ধ্বনি বাম্বা আর পোম্বার চন্দ্রালোকিত তীর বেয়ে দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়লো, সে-ধ্বনিতে হঠাৎ নদীর ধারের বক-পাখীদের ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় তারাও যেন চীৎকার করে প্রতাভিবাদন জানিয়ে উঠলো।

হঠাৎ জনতার মধ্যে একটা তীব্র আনন্দের উত্তেজনা জেগে উঠলো। যোদ্ধারা তাদের বর্শা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। কুকুরগুলো চীৎকার করে ডেকে উঠলো, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কলরব করে উঠলো, মেয়েরা বিয়ার আর 'কেনে'র মাদকতায় মাটীতে পা ঠুকে উল্লাসে চীৎকার করে উঠলো,

"গান্‌জা—গান্‌জা—গান্‌জা—"

সঙ্গে সঙ্গে লিংঘাগুলো থেকে গুরু-গুরু···গুর্-গুর্ আওয়াজ জেগে উঠলো।

চোখের সামনে ভোজবাজীর মতন যেন সব শাদা হয়ে গেল। ভস্মমাখা কালো মেয়ের আর কালো ছেলের সর্বাঙ্গ আজ শাদা, শাদা চাঁদের আলো···তার মধ্যে কালো শুধু গাছগুলো···মাটী লেপে শাদা করা হয়েছে···চাঁদের আলো এসে সারা গাঁকে চূণকাম করে দিয়েছে···শাদা ফিতের মতন চলে গিয়েছে

পথগুলো···পোম্বা আর বাম্বার জল আজ গলানো চাঁদের আলোর মতন শাদা।

যোদ্ধারা যে-যার বর্শা তুলে নিয়ে বড় বড় ঢালের আড়ালে অপেক্ষা করে থাকে···

এমন সময় দম্-দম্ করে বাজনা বেজে ওঠে···যোদ্ধারা লাফিয়ে বাম্বার দিকে এগিয়ে চলে···মাথার ওপরে ঢাল তুলে হাতের বর্শা ঘোরাতে ঘোরাতে উন্মাদ নৃত্যে তারা এগিয়ে চলে। কিছুদূর গিয়ে আবার তারা তেমনিভাবে নাচতে নাচতে ফিরে আসে। চীৎকার করতে করতে ফিরে আসে।

সুরু হয়ে যায় গান্‌জার নাচ। চারদিক থেকে বেজে ওঠে বাজনা···চারদিক থেকে ওঠে গান···সে সমবেত শব্দে যেন কেঁপে ওঠে চাঁদ।

এলোমেলো উল্লাসের মধ্যে একটা বন্দোবস্ত ঠিক করা হয়। কার পর কি হবে, তার একটা ক্রম নির্দিষ্ট হয়। সমস্ত খেলাধূলার ভার যাদের ওপর, তাদের নাম হলো মুকৌন্দজাইয়াংবা। তাদের দেখলেই বোঝা যায়, স্ফূর্তিতে ঝলমল করছে। তাদের পোষাকও আলাদা। মাথার চুলের সঙ্গে পাখীর লম্বা লম্বা রঙীন পালক গোঁজা ; কোমরে, হাঁটুতে, হাতের কব্জীতে ঘণ্টা বাঁধা।

তাদের ভেতর থেকে তিনজন বেরিয়ে এসে একটা যুযুৎসু ধরণের নাচ নাচলো। হাতের সঙ্গে পা জড়িয়ে নানা রকমের কসরৎ দেখালো। দর্শকেরা উল্লাসে বাহবা দিয়ে উঠে।

ক্রমশ প্রত্যেক দলই উত্তেজিত হয়ে উঠতে থাকে···হাততালি আর বাহবার ভেতর থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে মুকৌন্দজী-ইয়াংবাদের ঘণ্টার আওয়াজ। এইবার সুরু হবে শেষ নাচ···আসল নাচ···

জনতার ওপর দিয়ে যেন একটা আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়···সামনে নাচবার জায়গা খালি করে তারা গোল হয়ে পিছিয়ে আসে···সেই অবকাশে একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সেই শূন্য যায়গায় গিয়ে নাচতে সুরু করে দেয়।

তারা ক্লান্ত হয়ে আবার জনতার মধ্যে ফিরে আসে···এমন সময় মেয়েরা আসে এগিয়ে···পরিপূর্ণ নগ্ন দেহে···নাচবার জন্যে···

এইবার মেয়েরা নাচতে সুরু করলো। পরিপূর্ণ নগ্নদেহ···মাথার চুল আজ রেড়ীর তেলে সুচিক্কণ···নাকের ডগায়, কানে, ঠোঁটে নানা রঙের আংটির মতন গোল গয়না বিদ্ধ হয়ে ঝুলছে···হাতে পায়ে কোমরে পেতলের বালা। পার্শ্ববর্তিনীর কাঁধে হাত দিয়ে লাইন ধরে সারিসারি তারা এগুতে আরম্ভ করে।

হঠাৎ কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তারা গোল হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়···

পেছনের বাদ্য-যন্ত্র বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অঙ্গ দুলে ওঠে। বাদ্য-যন্ত্রের তালের সঙ্গে হাত আর পা দিয়ে তাল দিতে

দিতে তারা গান ধরে। গোল হয়ে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

সামনের দল নাচতে নাচতে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ভেঙ্গে যায়, তার মাঝখানে একটি মেয়ে এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়ায়। দুই চোখ বন্ধ করে সে নাচতে থাকে, উত্তপ্ত নগ্ন দেহে ফুটে ওঠে সুমধুর আমন্ত্রণ···বিভোর হয়ে সে নাচতে থাকে, যদি পড়ে যায় পেছনে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তারা ধরবে।

নাচ থামিয়ে মেয়েটি মেপে মেপে তিন পা এগিয়ে যায়, এক, দুই, তিন···সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে করতালি ওঠে। তিন পা এগিয়ে যাবার পর সে দেহকে এমনভাবে এলিয়ে দেয়, যেন তাকে গ্রহণ করবার জন্যে সামনে কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে··· হঠাৎ আবার মুখভার করে তিন পা পিছিয়ে আসে, এক, দুই, তিন···যেন তাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

আবার তেমনি মেপে মেপে তিন পা এগিয়ে যায়, আবার প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসে। বারবার এইভাবে প্রত্যাখ্যাত হতে হতে ক্লান্ত অবশ অঙ্গে নিদারুণ লজ্জায় ঢলে পড়ে।

তার সঙ্গিনীরা তৎক্ষণাৎ তাকে ধরে ফেলে। কাকুতি-মিনতি করে আবার তাকে দাঁড় করায়। আর সে এগিয়ে যায় না, সেই অর্দ্ধচন্দ্রের মধ্যে বাঁ দিকের একেবারে শেষ ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকের শেষাংশ থেকে আর একজন সঙ্গিনী ঠিক তেমনি তিন-পা মেপে এগিয়ে আসে। যে

অদৃশ্য প্রেমিক তার সঙ্গিনীকে প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দিয়েছে, তাকে ভোলাবার জন্যে আবার সে চেষ্টা করে।

ক্রমশ এইভাবে আসে পুরুষদের পালা। তখন চারদিকে জমে উঠেছে পরিপূর্ণ উন্মাদনা। যেদিকে চাও সেদিকে শুধু ঘর্মাক্ত মাংসপেশী আর তাণ্ডব আর্তনাদ। পায়ের তলায় মাটি যেন সে-উন্মাদ তাণ্ডবে ফেটে যাবে

সঙ্গে সঙ্গে কি অট্টহাসি, কি চীৎকার। সেই অগণিত নর-নারীর মিলনে, বিয়ার আর কেনের প্রেরণায়, উল্লাসে আর নৃত্যে জেগে ওঠে উন্মাদ আত্মহারা কামনার চঞ্চলতা···

সামনে এগিয়ে আসে দশজন পুরুষ···প্রায় নগ্ন দেহ।

সেই দশজনের মধ্যে, সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে বিসিবিং-গুইয়ের ওপর···সকলের চেয়ে সুগঠিত দেহ, সবচেয়ে সুন্দর। দুটো চোখ জ্বলছে, যেমন জ্বলে ওঠে রাত্তিরে বনের আগুন। প্রত্যেক মাংশপেশী পাথর দিয়ে তৈরী, আপনা থেকে যেন দুলে দুলে উঠছে। সরু কাঁচা বেতের মতন লিকলিকে দেহ নিয়ে সে লাফিয়ে ওঠে, দলের আর সবাইকে সে-ই চালিয়ে নিয়ে চলে।

তারা প্রত্যেকেই লাল-চন্দন আর তেল দিয়ে সারা দেহকে করেছে চিত্রিত। শরীরের মধ্যে যেখানে সুবিধা পেয়েছে সেই-খানেই ঝুলিয়েছে ঘণ্টা, এমন কি মাথায়-গোঁজা পালকের সঙ্গেও ঝুলিয়েছে ঘণ্টা। নড়তে গেলেই টুং টাং বেজে ওঠে দেহ।

গায়ের ওপর আঁকা রঙীন নক্সা ঘামে গলে যাচ্ছে···গা

থেকে উঠছে আগুনের মতন উত্তাপ। কিন্তু বিন্দুমাত্র ক্লান্তি কেউ বোধ করে না। তাদের দেহ মন আজ এই ইয়াংবাতে তারা সঁপে দিয়েছে।

কত ছোট মানুষের এই জীবন। দেখতে দেখতে কখন এসে যায় সেই দিন, যেদিন মৃত্যু এসে অশুচি করে দেয় দেহকে। প্রতিদিন সূর্য যখন ডুবে যায়, চুরি করে নিয়ে যায় সেই অল্প পুঁজি থেকে একটা করে দিন। তাই যতক্ষণ আছে সূর্য, ভোগ করে নাও যা ভোগ করতে পারে এই দেহ-মন।

সর্ব বাঁধন হারা তারা নাচতে শুরু করে দেয়।

মাটির দিকে মাথা নুইয়ে, দু'হাত মাটিতে ঠেকিয়ে, উঁচুতে পা তুলে তারা নানারকমের কসরৎ দেখায় প্রথমে। তারপর তারা দু'হাত মেলে উঠে দাঁড়ায়, সামনে পিছু, ডাইনে বাঁয়ে দু'-হাত দিয়ে বাতাসকে ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলে, যেন ডানা মেলে বাজপাখীর দল উড়ে চলেছে শীকার লুণ্ঠন করে নিয়ে।

চারদিক থেকে আবার বাজনা বেজে ওঠে, সেই সঙ্গে সুরু হয় গান্‌জার গান...

"গান্‌জা...গান্‌জা...গান্‌জা...

এখুনি আরম্ভ হবে গান্‌জা !

শিশু হবে মানুষ...

এখুনি শুরু হবে গান্‌জা...

এগিয়ে আসে একদল তরুণ কিশোর। তাদের সামনে এসে

দাঁড়ায় ছুরি হাতে দুজন বৃদ্ধ ওঝা, সর্বাঙ্গ ভরা মাদুলিতে। মেয়েদের সামনে এগিয়ে আসে একজন বৃদ্ধা। তরুণ কিশোরেরা নাচতে সুরু করে, উন্মাদ্ নৃত্য, এখুনি তাদের অঙ্গে আঘাত করবে সুপবিত্র ছুরি—গান্জার ছুরি—তারা হবে মানুষ, পুরো মানুষ···

চারদিক থেকে ওঠে গান্জার গান,
"গান্জা···গান্জা···গান্জা···
আজ রাত্তিরে তারা হবে পুরো স্ত্রীলোক,
আজ রাত্তিরে হবে তারা পুরো পুরুষ,
গান্জার ছুরির আঘাতকে আনন্দে সহ্য করে
তারা হবে আজকের উৎসবের মালিক।"

বৃদ্ধ ওঝা দুজন ছুরি হাতে নিয়ে মন্ত্র বলে,

"এক চাঁদ, দু চাঁদ ধরে, বনের গভীর নির্জনতায় তোমরা উপবাস দিয়ে নিজেদের তৈরী করেছ গান্জার জন্যে,

"এক চাঁদ, দু চাঁদ ধরে, লোকের কুৎসিত দৃষ্টির আড়ালে তোমরা তোমাদের দেহকে করে রেখেছো শুভ্র সুপবিত্র, যাতে মৃত্যু তোমাদের জব্দ করতে না পারে।

"এক চাঁদ, দু চাঁদ ধরে, তোমরা কোন অপবিত্র কথা বলো নি! শুধু আমাদের জাতির পবিত্র ভাষা উচ্চারণ করেছো। লোকের পাপ-দৃষ্টির আড়ালে তোমরা শুধু ফল মূল খেয়ে জীবন ধারণ করেছো।

"এক চাঁদ, ছু চাঁদ ধরে, তোমরা যেখানে খুশী, যেভাবে খুশী শুয়ে রাত কাটিয়েছো! এক চাঁদ, ছু চাঁদ ধরে তোমরা কোন খেলা, কোন হাসি, কোন রঙ্গ-তামাসায় নিজেদের কর নি নষ্ট।

"ভগবান নাঙ্গাকৌরা তাই তোমাদের ওপর হয়েছেন সন্তুষ্ট। ছু চাঁদ ধরে এই কঠিন পরীক্ষায় তোমরা উত্তীর্ণ হয়েছো। এখন তোমরা সকলের সামনে হাসতে পার, খেলতে পার, নাচতে পার, এখন তোমরা যে-যার বোগ্‌বোতে শুতে পারো।

"এখুনি তোমরা পুরুষ হবে। এখুনি তোমরা স্ত্রীলোক হবে। গান্‌জার ছুরি এখুনি তোমাদের সে-গৌরব এনে দেবে।

"তাই নাচো, গাও, উৎসব করো।"

চারদিক থেকে ওঠে উন্মাদ রব,

গান্‌জা, গান্‌জা, গান্‌জা…

গান্‌জার লগ্ন এগিয়ে আসে। ওঝারা ছুরিতে শাণ দিয়ে ঠিক করে নেয়। আঘাত গ্রহণ করবার জন্যে গান্‌জার উদ্দিষ্ট তরুণ-তরুণীরা প্রস্তুত হয়। বালাফোন, লিংঘা, কৌন্দে, তাদের যত রকমের বাজনা ছিল, সব একসঙ্গে তারস্বরে বেজে ওঠে। যেন যন্ত্রণার চীৎকার সেই শব্দের মধ্যে ডুবে যায়।

সুরু হয়ে যায়, লিঙ্গচ্ছেদের অনুষ্ঠান।

একটা বড় পাথরের ওপর থুতু ফেলে, পুরোহিতেরা শেষবারের মত ছুরি শাণ দিয়ে ঠিক করে নেয়।

পুরোহিতদের সাহায্যকারীরা হাতে ছড়ি নিয়ে এগিয়ে আসে। যাদের লিঙ্গোচ্ছেদ হবে তাদের পিঠে নিয়মিতভাবে প্রহার করে চলে। সেই প্রহারের ফলে তারা ক্রমশ অচৈতন্য হয়ে আসে। যদি কেউ যন্ত্রণায় চীৎকার করে ওঠে, অথবা পড়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে, মানুষ হবার অযোগ্য সে। তার বেঁচে থাকবার কোন দরকার নেই। সেইখানেই প্রহারে প্রহারে তার অবশিষ্ট প্রাণটুকু কেড়ে নেওয়া হয়। এই লোকাচার··· অনাদিকাল থেকে চলে আসছে।

যে-তরুণটির ওপর সর্বপ্রথম এই পরীক্ষা চলছিল, সে উন্মাদ চঞ্চলতায় মৃত্যুকে তুচ্ছ করে উল্লম্ফন করতে থাকে, জনতা উল্লাসে বাহবা দিয়ে ওঠে, মানুষ হবার যোগ্য সে।

প্রত্যেক লাফের সঙ্গে তার রক্তাক্ত দেহ থেকে রক্ত ছিটকে গিয়ে পড়ে নিকটবর্তী জনতার গায়ে। তাকে দেখাতে হবে, তার কোন যন্ত্রণাই হচ্ছে না। আনন্দে নাচতে নাচতে তাকে গাইতে হবে

'গান্‌জ···গান্‌জা···গান্‌জা···
জীবনে শুধু একবার···'

বৃদ্ধ ওঝা দুজন চারিদিকের উন্মাদ কলরবের মধ্যে সম্পূর্ণ নিস্পৃহভাবে নিজেদের কাজ করে চলে। যন্ত্রচালিতের মত তাদের হাতের কাঁচা চামড়া কেটে চলে, তারা যেন কিছুই শুনতে পাচ্ছে না, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। মাঠে যখন শস্য পেকে

ওঠে, চাষী যেমন কাস্তে দিয়ে তা কেটে চলে, তেমনি ধারা তারাও ছুরি নিয়ে কেটে চলে।

মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ নাচতে নাচতে ম্লান বিবর্ণ, অবশ হয়ে ওঠে। কোথা থেকে একটা অসহনীয় ভয় তাদের সর্বাঙ্গকে যেন হিম করে দিয়ে যায়।

বৃদ্ধা পুরোহিত-নারী এগিয়ে এসে প্রথমে একজন মেয়েকে ডাক দেয়, জোর করে তাকে জড়িয়ে ধ'রে ছুরি নিয়ে অবলীলাক্রমে তার কাজ করে চলে। কাটা শেষ হয়ে গেলে দ্বিতীয় জনের ডাক পড়ে। নাচতে নাচতে আর গাইতে গাইতে সে এগিয়ে আসে,

গান্‌জা···গান্‌জা···গান্‌জা···
জীবনে তো একবার মাত্র এই যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে,
তারপর, সারা জীবন ভ'রে,
তুমি থাকবে আমার পাশে,
ওগো, তরুণ-বীর, যে আজ উত্তীর্ণ হলে
এই গান্‌জার পরীক্ষায়।'

ক্রমশ কলরব আরো বাড়তে থাকে।

এরপর যে কলরব আরম্ভ হবে, তার কাছে এখনকার এই আওয়াজ কিছুই নয়। কারণ, এই সব অনুষ্ঠান শেষ হবে গিয়ে উৎসবের প্রধানতম ব্যাপারে, প্রণয় নৃত্যে। এই প্রণয়-নৃত্যের রাতের জন্যে সারা বছর তারা অপেক্ষা করে থাকে। বছরে

একদিন মাত্র আসে এই প্রণয়-নৃত্যের রাত। এই রাতে তারা অবাধে ছেড়ে দেয় তাদের মনের সমস্ত কামনা, বাসনা আর প্রবৃত্তিকে। এই রাতে অসংযম আর অনিয়ম পায় সামাজিক অনুমোদন। অপরাধহীন অনাচারের মধু রাত।

দেখতে দেখতে প্রত্যেক বাদক যে-যার যন্ত্র নিয়ে অপরের সঙ্গে তুমুল প্রতিযোগিতা স্থরু করে দেয়। এতক্ষণ পরে যোগ দেয়, বৃহৎ-আকার সব শিঙ্গা। তাদের তুমুল চীৎকারে বাতাস কেঁপে কেঁপে ওঠে। সে চীৎকারে শিকারী পাখীরা নাড় ছেড়ে উৎসব-ক্ষেত্রের ওপর ঝাঁক বেঁধে ঘুরতে থাকে।

সেই তুমুল যন্ত্র-কোলাহলের মধ্যে, ছুটি নারী এগিয়ে আসে, একজন ইয়াসীগুইন্দজা, বাতোয়ালার প্রধানা মহিষী, আর একজন তরুণী, এখনো কোন পুরুষের স্বামীত্বের চিহ্ন তার দেহের ওপর পড়েনি।

ছুজনেই নগ্ন, পরিপূর্ণ নগ্ন দেহ। সারা অঙ্গে শুধু কাঁচের নানা রকমের গহনা, গলায়, কোমরে, হাতের কব্জীতে, পায়ে। সারা অঙ্গে মেটে লাল রঙের প্রলেপ।

এ ছাড়া ইয়াসিগুইন্দজার অঙ্গে একটা লাল রঙের কাঠের প্রতীক চিহ্ন, কোমরে গহনার সঙ্গে ঝুলতে থাকে। আজকের এই নাচের উৎসবে সে যে প্রধানা, তারই চিহ্ন।

ইয়াসীগুইন্দজা নাচতে স্থরু করে। প্রথমে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুধু কোমর আর উরুদেশ নাচাতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে ছুলতে

থাকে সেই কাঠের প্রতীক।

তারপর ধীর পদক্ষেপে সে অপেক্ষমান তরুণীটির দিকে এগিয়ে আসে। তাকে হাত বাড়িয়ে আমন্ত্রণ জানাতে, তরুণীটি কয়েক পা পিছনে সরে যায়। প্রত্যাখ্যান। তরুণী তার ভঙ্গী দিয়ে জানিয়ে দেয়, এমনিভাবে পুরুষের কামনার আগুনে নিজেকে আহুতি দিতে সে চায় না। নানা অঙ্গভঙ্গী করে সে লাফাতে থাকে। যেন সে ভীত। ইয়াসীগুইন্দজা যেন তার প্রণয়-প্রার্থী পুরুষ।

তরুণীর প্রত্যাখ্যানে প্রণয়ী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। দুরন্তভাবে মাটীতে পা ঠুকে ঠুকে সে তার অন্তরের ক্ষোভকে নিবেদন করে। তরুণীটির ভয় যেন একটু একটু করে ভেঙ্গে যায়। দূর থেকে সে নিজেকে সমর্পণ করবার ভঙ্গী করে।

দ্রুত ছুটে যায় প্রণয়ী তার কাছে, তাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করে। কিন্তু তরুণী কপট লজ্জায় তখনও মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে সরে দাঁড়ায়। দু হাত দিয়ে চোখ ঢেকে থাকে। সুরু হয়, শিকার। শিকারী তেড়ে যায়, শিকার ছুটে পালায়। থমকে দাঁড়ায়, দু পা এগোয়, আবার দুপা পিছিয়ে যায়। শিকারী ক্রমশ উন্মাদ হয়ে ওঠে। উন্মাদ আক্রমণে শিকারকে জড়িয়ে ধরে, নিজের দেহের সঙ্গে যেন পিষে ফেলে। চোখে, মুখে ফুটে ওঠে কামনার বীভৎস নির্লজ্জতা। শিকার আত্মসমর্পণ করে।

সঙ্গে সঙ্গে তুমুল শব্দে বেজে ওঠে বাজনা। বিদ্যুৎ-আহতের মতন নিমেষের মধ্যে জনতা ক্ষিপ্ত উন্মত্ত হয়ে ওঠে। পুরুষেরা ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তাদের ক্ষীণ কটীবাস। মেয়েরা ছিঁড়ে ফেলে দেয় সামান্য লজ্জা-বস্ত্র। সমস্ত উৎসব-অঙ্গন এক সঙ্গে নেচে ওঠে। নাচতে নাচতে প্রত্যেকে বেছে নেয় তার সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে। সমস্ত উৎসব-ক্ষেত্র টলমল করে ওঠে কামনার সেই উন্মাদ নৃত্যে।

ইয়াসীগুইন্দজা আর তার নৃত্য-সঙ্গিনীকে কেন্দ্র করে, প্রত্যেক পুরুষ তার নৃত্য-সঙ্গিনীকে বেছে নেয়, জোড়ায় জোড়ায় তারা নাচতে সুরু করে।

সুরা আর ঘন-সান্নিধ্যের গন্ধে বাতাস উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। চারদিক থেকে কানে আসে অস্ফুট চীৎকার, আক্রান্তের আর্তনাদ, দেহ-পীড়িতের মধুর প্রতিবাদ···

প্রকাশ্যে, সকলের সামনে, অরণ্যের বন্য পশুর মতন বাধা-বন্ধহারা প্রচণ্ড উল্লাসে তারা মেতে ওঠে, অরণ্য পশুর মতন সংস্কারবিহীন মুক্ত। কামনার মদিরকে দ্বিগুণিত করে তোলে ফেনিল সুরার পাত্র···

ক্রমশ বাজনা থেমে আসে। যন্ত্রীর দল তাদের বাজনা দিয়ে যে উন্মত্ত আকাঙ্খাকে জাগিয়ে তুলেছিল, উত্তুঙ্গ করে তুলেছিল, তাতে তাদেরও ন্যায্য অংশ গ্রহণ করবার জন্যে বাজনাকে ফেলে দিয়ে এগিয়ে আসে। যদিও অন্য সব দলের মতন তেমন নিপুণ-

ভাবে তারা নাচড়ে পারে না, তবুও সেই নৃত্যের উত্তাল তরঙ্গে তারা নিজেদের ভাসিয়ে দেয়, কারণ আজিকার দিনের এই নৃত্য, প্রণয়-নৃত্য, তাদের উৎসব-জীবনের সর্বোত্তম অনুষ্ঠান, আদিম কাল থেকে এই নৃত্য দিয়ে এসেছে তাদের জীবনে নিবিড় আনন্দের প্রেরণা···অস্তিত্বের স্বাদ···

তারা নেচে চলে। অবিশ্রান্ত···অবিরাম। গ্রীষ্ম দিনের পর যখন প্রথম বর্ষার ধারা মাটিতে এসে পড়ে, সেই সময় জলের সংযোগে তপ্ত মাটি থেকে যে-রকম বাষ্প ওঠে, তেমনিধারা একটা বাষ্প যেন তাদের অঙ্গ থেকে সমস্ত বাতাসকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

সহসা সেই উন্মাদ নৃত্য-উৎসবের মধ্যে, কারা দুজন মাটিতে পড়ে গেল···বাতোয়ালা ক্ষিপ্ত শার্দুলের মতন তাদের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে···হাতে ঝক্মক্ করে ওঠে শাণিত ছুরিকা···

উত্তেজিত ঘোড়ার মতন সফেন হয়ে ওঠে মুখ।

আঘাত করবার জন্যে হাত তোলে।

কিন্তু হাত তোলা আর আঘাত করার মধ্যে যেটুকু অবকাশ, তার ভেতর, যে দুজন পড়ে গিয়েছিল, তারা উঠে বাতোয়ালার হাতের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়, ইয়াসীগুইন্দজা আর বিসিবিংগুই।

তারা উৎসবক্ষেত্র থেকে ছুটে পালায়।

বাতোয়ালা তাদের পেছনে তাড়া করে ছোটে···

এত বড় আস্পর্দ্ধা! কুকুরের বাচ্ছা, ঐ বিসিবিংগুই আর

ইয়াসীগুইন্দজা, তার চোখের সামনে এই রকম ভাবে···

পথ-কুক্কুরী ঐ স্ত্রীলোক···জ্যান্ত তার গায়ের চামড়া সে খুলে নেবে!

আর বিসিবিংগুই-এর দেহ এমন বিকৃত করে দেবে যে, মেয়েরা দেখলে হাসবে!

ঐ ইয়াসীগুইন্দজা! রীতিমত মূল্য দিয়ে তাকে সে কিনে নেয় নি? সাত সাতখানা কটিবাস, এক বাক্স নূন, তিনটে পেতলের গলার হার, চারটে হাঁড়ি, দুটা মুরগী, কুড়িটা ছাগলের বাচ্ছা, চল্লিশ ঝুড়ি ভুট্টার দানা আর একটা ক্রীতদাসী···এতখানি মূল্য দিয়ে বাতোয়ালা তাকে কিনেছিল!

যেমন কাজ, তেমনি তার শাস্তি হবে। তাকে যদি আবার গ্রহণ করতে হয়, তাকে পরীক্ষা দিতে হবে···বিষ খেয়ে তাকে পরীক্ষা দিতে হবে···তাকে বাতোয়ালা বাধ্য করাবে সেই বিষ-পরীক্ষা নিতে!

অকস্মাৎ সেই ব্যাপারে চারদিক থেকে একটা তুমুল কলরব জেগে উঠলো···কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কার হুকুমে সমস্ত কলরব নিমেষে স্তম্ভিত হয়ে গেল···প্রস্তর-নীরব।

সেই প্রস্তর-নীরবতাকে ভেদ করে রূঢ় কণ্ঠে কে ঘোষণা করে উঠলো, কমাণ্ডার···ঐ কমাণ্ডার আসছে!

চারদিক থেকে ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে আর্তনাদ পড়ে গেল, কমাণ্ডার···ঐ কমাণ্ডার আসছে! যে যেদিকে পারলো আতঙ্কে

ছুটে পালাতে লাগলো···কয়েক মুহূর্তের ভেতর শূন্য হয়ে গেল উৎসব-ক্ষেত্র···পড়ে রইলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খাবারের স্তূপ···শূন্য বোতল···পরিত্যক্ত কটিবাস···বাসন-পত্র···আর তার মাঝখানে পলায়নে-অক্ষম এক বৃদ্ধ···সুরার কৃপায় একটা বাদ্য-যন্ত্রের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে···সুগভীর নিদ্রায় অচেতন। কে বলবে এক মুহূর্ত আগে এখানে উঠেছে কামনার উন্মাদ কলরব!

"ইনে···দিয়েই···ইনে···দিয়েই···ইনে দিয়েই! ডাইনে! হল্‌ট্‌!"

সৈন্যরা মার্চ করে এগিয়ে আসে। মাটীতে বন্দুক ঠোকার আওয়াজ হয়। কমাণ্ডারের সৈন্যরা ফিরে এসেছে।

সার্জেন্ট সিল্লাতিগুই কোনাতে-র পুরুষ-কণ্ঠে আদেশ শোনা যায়, ইক্‌সে!

সৈন্যরা সঙ্গীন পাশে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায়।

ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে ফরাসী কমাণ্ডার এগিয়ে আসে!

সার্জেন্ট কোনাতে আবার হেঁকে ওঠে···ডাইনে···মুখ ফিরিয়ে সোজা···

সৈন্যরা ঘুরে দাঁড়ায়।

কমাণ্ডার সার্জেন্টের দিকে চেয়ে কৈফিয়ৎ চায়, চারদিকে এ সব জঞ্জাল কি? এর মানে কি? কিছুক্ষণ আগে দূর থেকে যে গোলমাল কানে আসছিল তারই বা মানে কি?

সার্জেণ্ট জবাব দেয়, পথে আসতেই খবর পেলাম, এখানকার লোকগুলো আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে এই মাঠে এসে মদ খেয়ে হৈ-হল্লা করেছে !

কমাণ্ডার তৎক্ষণাৎ আদেশ দেয়, বেশ কথা···কিন্তু এই অপরাধের জন্যে এই অঞ্চলের প্রত্যেক সর্দারকে এক শো ফ্রাঙ্ক করে জরিমানা দিতে হবে এবং তা দিতে হবে আজকে রাত্রি শেষ না হতেই। যদি না দেয়, তাহলে সোজা ফাঁড়ি, হাতে পায়ে বেড়ি আর উত্তম মধ্যম বেত !

সার্জেণ্ট অভিবাদন জানিয়ে বলে, এখুনি তার ব্যবস্থা করছি, হুজুর !

হঠাৎ সেই পরিত্যক্ত জিনিস-পত্রের মধ্যে কমাণ্ডারের দৃষ্টি সেই নিদ্রিত বৃদ্ধের ওপর গিয়ে পড়ে।

সামনে ঐ ডার্টি নিগার···ও বেটা কে ওখানে শুয়ে ?

সার্জেণ্ট কাছে গিয়ে জবাব দেয়, বাতোয়ালার বাবা !

সার্জেণ্ট কোনাতে একদিন এখানকারই অধিবাসীদের একজন ছিল। তাই সবাইকেই চেনে।

কমাণ্ডার গর্জে ওঠে, ওখানে কি করছে হারামজাদা ?

সার্জেণ্ট জবাব দেয়, হুজুর, একটু বেশী খেয়ে ফেলেছে···তাই বেসামাল হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে !

কমাণ্ডার সেইদিকে চেয়ে বলে ওঠে, বেটার পাশে···ওগুলো আমাদের ফরাসী মদের বোতল না ?

—আজ্ঞে, হুজুর!

এইবার খোঁজ পড়ে ষ্টেশন-প্রহরীর, যার জিম্মায় এই মাঠ ছিল।

কমাণ্ডার জিজ্ঞাসা করে, আর সেই শূয়োরের বাচ্ছা বৌলা··· সেই খোঁড়া কুকুরটা কোথায়? এই যে, একেবারে হুজুরে হাজির দেখছি! গুড মর্নিং খোঁড়া কোলা ব্যাঙ!

বৌলা কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দেয়, গুড মর্নিং স্যার!

কমাণ্ডার তেমনি ব্যঙ্গের সুরে আদেশ দেয়, আমার অবর্তমানে যাতে অতঃপর আপনি ষ্টেশনের চৌকিদারী কাজে আরো একটু তৎপর হতে পারেন, তার জন্যে আপনাকে পনেরো দিন ঠাণ্ডা গারদে বাস করতে হবে এবং এক সপ্তাহের মাইনে কাটা যাবে। বুঝলেন? দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি? দূর হও··· দূর হও আমার সামনে থেকে! নিতান্ত ভাগ্য ভাল যে এত কমে এবারের মতন তোমাকে রেহাই দিলাম···

তারপর সার্জেণ্টের দিকে চেয়ে আদেশ দিলো, সিল্লাতিগুই! আজকের মতন সৈন্যদের সকলকে ছুটি দাও! বিশ্রাম! আজ রবিবার···সবাই বিশ্রাম করুক! বুঝলে? যাও, এদের ছুটি দিয়ে দাও!

দেখতে দেখতে সৈন্যরা চলে যায়। কিন্তু সেই ঘুমন্ত বৃদ্ধ তখনও একলা পড়ে থাকে···

তখন ভোর হয়ে আসছে···গ্রীষ্মদিনের রাত-প্রভাতের

প্রথম প্রহর···ঘন কুয়াসার মধ্যে ডেকে উঠছে দু'একটা পাখী···
একদিন ভোজ, সারা বছর উপবাস। রৌদ্র-শুষ্ক বসন্ত দিনের পর আসে বর্ষার ভিজে দিন···উল্লাসের সর-সঙ্গীতের পর আসে কান্নার সুর···হাসির পর আসে অশ্রু।

উৎসব যখন পুরো মাত্রায় চলেছিল, বাতোয়ালার বৃদ্ধ পিতা তখন অতিরিক্ত সুরা পানে উৎসব-প্রাঙ্গনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেই ঘুমের ভেতর দিয়ে বৃদ্ধ তখন যাত্রা করে চলেছিল, নিবিড় ঘন-অন্ধকার লতা-গুল্মের ভেতর দিয়ে সেই দূরতম গাঁয়ে যেখান থেকে আজও পর্যন্ত কেউ আর ফিরে আসতে পারে নি। তার চারপাশে তখন চলেছিল উন্মাদ-নৃত্য। কেউ দেখেনি, বৃদ্ধ চিরকালের মতন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

মদের পেয়ালায় মৃত্যু! এর চেয়ে সুখের মরণ আর কি হতে পারে! শেষ মুহূর্তের অনুশোচনা, অস্তিমের অসহায় বিলাপ আর বেদনা, সমস্ত ঢাকা পড়ে যায় ফেনিল নেশায়। ঘুম থেকে মৃত্যু, শুধু একটা ছোট্ট ধাপ। কোন চেষ্টা নেই, কোন পরিশ্রম নেই, কোন যাতনা নেই। শুধু অন্ধকার ছায়ায় নিঃশব্দে আর একটু গড়িয়ে যাওয়া। ভাববার কিছু থাকে না। মধুর মরণ! সারা জীবনের ক্লান্তির শেষে বিশ্রাম নাঙ্গাকোরার বিশাল স্বর্গ-রাজ্যের একপ্রান্তে এক ধারে কোথাও বিশ্রাম··· চির বিশ্রাম।

সেখানে কোন মশার উৎপাত নেই, কোন পোকার কামড়

নেই, কোন কুয়াশার জ্বালা নেই, কোন হিমের কাঁপুনি নেই। কোন কাজ করবার তাগাদা নেই; কোন খাজনা দিতে হবে না, কোন বোঝা বইতে হবে না। কেউ কম দামে জিনিস ঠকিয়ে নেবে না, খেসারতের দাবীর জন্যে কেউ সৈন্য পাঠাবে না। পরিপূর্ণ শান্তি···অবাধ আরাম! কোন কিছু পাবার জন্যে মেহনৎও করতে হবে না, অপূর্ণ বাসনার জ্বালাও ভুগতে হবে না। না চাইতেই সেখানে সব পাওয়া যায়, অমনি, বিনা মূল্যে··· এমন কি স্ত্রীলোক পর্যন্ত।

যেদিন থেকে তাদের দেশে বিদেশী সৈনিকরা এসে বসেছে, সেদিন থেকে ভালমানুষ নিগ্রোদের একমাত্র কামনার বস্তু হয়ে উঠেছে, মরণ, এই দেশ ছেড়ে সেই নাঙ্গাকৌরার দেশে যাওয়া। দাসত্বের যন্ত্রণা থেকে একমাত্র মুক্তির উপায়।

সেদিন থেকে তাদের একমাত্র আনন্দ পাবার জায়গা হলো ঘন-অন্ধকার লতাগুল্মের ওপারে সেই সুদূর সব-পাওয়ার দেশ, যেখানে তারা শুনেছি শাদা-লোকদের প্রবেশ নিষেধ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রাচীন প্রথা-অনুযায়ী বাতোয়ালার পিতার প্রাণহীন দেহকে তারা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখলো, আট দিন আর আট রাত্রি ধরে গ্রামের সমস্ত মেয়েরা মৃতদেহকে ঘিরে কাঁদলো, অঝোরে বিলাপ করলো। অশৌচের চিহ্নস্বরূপ

মাথায় ছাই মাখলো, সারা মুখ কালি দিয়ে কালো করলো। আটদিন আটরাত ধরে সেই মৃতদেহকে ঘিরে তারা কেঁদে কেঁদে নাচলো, শোকে আছড়ে আছড়ে পড়লো, সারা গা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল।

তাদের পাশে দাঁড়িয়ে পাঁচখানা গাঁয়ের লোক ধীরে সৎকারের শেষ মন্ত্র গেয়ে চললো,…

"বাবা, তুমিই আজ সত্যিকারের সুখী।
দুঃখী আমরা, যারা পড়ে রইলাম,
যারা তোমার জন্যে শোক করছি।"

জীবনের একঘেয়ে বিষাদের ছন্দকে ভাঙবার জন্যে যদি পাল-পার্বণের ব্যবস্থা না থাকতো, কে চাইতো বেঁচে থাকতে? নিচ্ছিদ্র দুঃখের মধ্যে এই সব পুরানো রীতি-নীতি তাই বাঁচিয়ে রেখেছিল প্রাণের আগুনকে, বৈচিত্রকে।

তা না হলে, যে মরে গেল, তার দিকে চেয়ে দেখবার আর কি আছে? তার কাছে চাইবার বা আশা করবার আর কিছুই নাই। মানুষের সঙ্গে তার সব সম্পর্ক গিয়েছে ছিঁড়ে, কি আর আছে তার মূল্য? আজ আর তো সে সমাজের কেউ নয়! একটা শুকনো পাতার মতন, শুকনো এক টুকরো হাড়ের মতন, নিস্প্রয়োজন, নিরর্থক।

কিন্তু আবহমানকাল থেকে চলে আসছে, এই পৃথিবী ছেড়ে যে-যাত্রী চল্লো নাঙ্গাকৌরার দেশের দিকে, তার যাত্রাপথের

চারদিকে নাচতে হবে, গাইতে হবে, তার শেষ-যাত্রা যেন মানুষের সুরে শব্দে সজাগ হয়ে থাকে।

এক সপ্তাহ সেইভাবে মৃতদেহকে নিয়ে শোক করবার পর, তাকে সমাহিত করতে হবে। গাছের গায়ে তার মৃতদেহ থেকে মাংস গলে পড়বে এবার···চারদিক থেকে ছুটে এসেছে, শবলোভী মাছির দল।

তা ছাড়া তখন এসে পড়েছে শিকারের দিন। মৃতকে নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। এই হলো শিকারের সময়। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যার পর গ্রামের চারদিক থেকে উঠেছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশের দিকে···পোড়া ঘাসের গন্ধে ভারী হয়ে থাকে বাতাস। তার মাঝে ভেসে আসে টম্-টম্ বাজনার আওয়াজ। চারদিকে বন হয়ে উঠেছে সবুজ। বুনো লতার তাজা গন্ধে রক্তে লাগে দোলা।

তাই মৃতদেহকে এখন তাড়াতাড়ি বীজের মতন মাটীর ভেতর পুঁতে ফেলতে হবে। শোক যা করবার তা করা হয়ে গিয়েছে, রীতি-নীতি যা পালন করবার, তা যথারীতি পালন করা হয়ে গিয়েছে। এখন মাটীর তলায় থাকুক মৃতদেহ, তাদের বেরুতে হবে শিকারে।

আজকাল অবশ্য এমন নিখুঁতভাবে পুরানো রীতি-নীতি লোকে মানতে চায় না। বিশেষ করে যারা শাদা লোকগুলোর সংস্পর্শে এসেছে, যারা শাদা লোকগুলোর দাসত্ব করে তারা এই

সব পুরানো রীতি-নীতির কথা শুনে ঠাট্টা করে।

অল্প বয়সে ছেলে-ছোকরার দল এমনি ধারা ঠাট্টা তো করবেই। আজ বুড়োলোকদের তারা মানতে চায় না। বুড়োদের বিদ্যে-বুদ্ধির তারিফ করে না। কোন কিছু বিচার করে ভেবে দেখতেও চায় না। ছেলে-ছোকরার দল ভাবে যে হাসলেই বুঝি সব যুক্তি উড়ে চলে গেল।

কিন্তু পুরানো রীতি-নীতি এত হাল্কা জিনিস নয়। শত শত বৎসর ধরে শত শত বৃদ্ধের বিচার-বুদ্ধির ফলে, অভিজ্ঞতার ফলে এই সব আচার-নীতি গড়ে উঠেছে। সমস্ত জাতের অভিজ্ঞতা এই সব পুরানো রীতি-নীতির মধ্যে তিল তিল করে জড়ো হয়েছে। হেসে উড়িয়ে দিলেই হলো ?

এই যে আটদিন ধরে মৃতদেহকে গাছের সঙ্গে প্রকাশ্যে সকলের দেখবার জন্যে রাখা হয়, শাদা লোকগুলো এই রীতির ওপর ভারী চটা। তারা জানে না, কেন মৃতদেহকে এইভাবে এতদিন রাখা হয়। দূর দূরান্ত বনের ভেতর, দূর গাঁয়ের যে-সব লোক আছে, তাদের আসতে তো সময় লাগে! তাদের সকলের তো আসা চাই! টম্-টম্ বাজিয়ে তাদের সকলকে খবর দিতেও তো সময় লাগে!

তা ছাড়া, সেকালের জ্ঞানী লোকেরা দেখেছে, অনেক সময় যাকে মনে হয়েছে মৃত বলে, আসলে সে কিন্তু তখনও মরেনি। হয়ত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল মাত্র। তারা দেখেছে,

এমনি বহু লোককে ঘুম থেকে আবার জেগে উঠতে। তাই তারা নিয়ম করে গেল, মরলেই যাতে মানুষকে মাটির ভেতর পুঁতে না ফেলা হয়। একটা সময় পর্যন্ত দেখতে হবে, সেটা ঘুম, না মৃত্যু! শাদা লোকেরা এ সব কথা বুঝবে কি করে?

বাতোয়ালা মনে মনে এইসব কথাই ভাবছিল আর মাঝে মাঝে চাপা গলায় বিসিবিংগুইকে জানাচ্ছিলো।

সামনে বৃদ্ধ পিতার অন্তিম সৎকার হচ্ছে। বিসিবিংগুই তার পাশেই বসে আছে। উৎসবের পরের দিনই তাদের দুজনার ঝগড়া বাইরে থেকে মিটমাট হয়ে যায়। দুজনেই স্বীকার করে নেয় অতিরিক্ত মদ্যপানের দরুণ তারা সাময়িকভাবে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলো। তাই তাদের পুরানো অন্তরঙ্গতা মনে হয় অব্যাহতই রয়েছে।

কিন্তু বিসিবিংগুই মনে মনে জানে, সেদিনকার ব্যাপারের দরুণ বাতোয়ালা প্রকৃতপক্ষে তাকে মন থেকে ক্ষমা করতে পারে নি। সুযোগ পেলেই সে তার উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবে। নীরবে সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছে বাতোয়ালা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মেয়েরা গেয়ে চলে,
'বাবা, তুমিই প্রকৃত সুখী,
আমরা যারা শোক করবার জন্যে পড়ে রইলাম,

আমরাই আসলে দুঃখী।'

শাদা-লোকরা যখন অপমানিত হয়, তখন তারা সদ্য সদ্য তার প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু আফ্রিকার এই কালো-লোকদের প্রতিশোধ নেবার রীতিও আলাদা।

তারা জানে, প্রতিহিংসা গরম গরম পরিবেশন করতে নেই। তাই তারা বাইরের হাসি-খুশী আর মিষ্টি ব্যবহারে প্রতিহিংসার জ্বালাকে লুকিয়ে রাখে, ছাই দিয়ে যেমন আগুনকে লুকিয়ে রাখতে হয়···ছাই-এর তলায় আগুনের কণা নীরবে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে।

তাই যার ওপর প্রতিহিংসা নিতে চাও, তোমার সেই শত্রুকে আদর করে তোমার বাড়ীতে ডেকে নিয়ে এসো, নেমন্তন্ন করো, পেট ভরে খাওয়াও, দরকার হলে টাকা দিয়ে সাহায্য করো। তোমার দেবার মত যা কিছু আছে, সব তোমার শত্রুর হাতে তুলে দাও। এমন কি, সে না চাইতেই, তুমি আগে থাকতে তার মনস্কামনা পূর্ণ করো। তার সন্দেহকে একেবারে ঘুম পাড়িয়ে দাও। হল্‌দে আর শাদা রঙ হলো বন্ধুত্বের চিহ্ন, সুগভীর অন্তরঙ্গতার চিহ্ন···বেছে বেছে তোমার সবচেয়ে শাদা বা হল্‌দে মুরগীর ছানা তোমার শত্রুর জন্যে রেখে দাও। কিছুতেই যাতে তোমাকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করতে পারে।

এই বঞ্চনার খেলা, যতদিন দরকার, চালিয়ে যেতে হবে। অসহিষ্ণু হলে চলবে না। বহুদিন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা

করে থাকতে হবে, যতক্ষণ না উপযুক্ত সুযোগের লগ্ন আসে। ঘৃণা হলো চরম ধৈর্যের ব্যাপার।

তারপর, যখন সবদিক থেকে সুযোগ ঘনিয়ে আসবে, তখন নিঃশব্দে তাকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলো,…এতদিন ভায়ের মতন যাকে কাছে কাছে রেখেছো, তাকে বিষ দিতে বিশেষ আর হাঙ্গামা করতে হবে না।

তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী…তোমার শত্রু…তার সঙ্গে তোমার আসল সম্বন্ধ হলো, নেকড়ের সম্বন্ধ…নেকড়ে…বনের সমস্ত পশুদের মধ্যে সবচেয়ে ক্রুর, সবচেয়ে নির্মম, নিষ্ঠুর—

আকাশে যখন চাঁদ থাকে না, অন্ধকারে থম্ থম্ করে বন, সেই সময়ে নেকড়ে বেরোয় শিকারে…

অন্ধকারে অতর্কিতে এক নিমিষে শিকারের টুঁটি চেপে ধরে —নখ আর দাঁত দিয়ে টুকরো টুকরো করে তাকে জবাই করে… রক্ত পান করবার আগেই রক্তের গন্ধে মুখের সমস্ত পেশী সবল হয়ে ওঠে…টাটকা, তাজা গরম রক্ত, তখনও তা থেকে উঠছে ধোঁয়া, সে-রক্ত না হলে তার তৃষ্ণা মেটে না। সেই রক্ত পান করেও সে তৃপ্ত হয় না, সেই রক্ত সর্বাঙ্গে মেখে আনন্দে তাতে গড়াগড়ি দেয়, সুরার মত সে তপ্ত রক্ত মাতাল করে তোলে তাকে—বহুক্ষণ পর্যন্ত বাতাসে রক্তের তীব্র গন্ধ মশগুল করে রাখে তাকে…

নিজের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে এই নেকড়েকে। অমনি

চাঁদ-ডোবা এক অন্ধকার রাত্রিতে, যে-বুনো পথ দিয়ে তোমার শিকার যাবে, তার ধারে মুখেতে মুখোস পরে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে···অপেক্ষায়···

তারপর···ঐ···ঐ আসছে শিকার! একটা উন্মাদ লাফ—এক নিমিষে মাটিতে ফেলে দুই হাত দিয়ে সজোরে গলা টিপে ধরো···তারপর নেকড়ের মতন, কোমর থেকে সরু ছুরি নিয়ে, কিম্বা নিজের লম্বা ধারালো নখ দিয়ে গলার নলিটা টেনে ছিঁড়ে ফেলো···তারপর নেকড়ের মতন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলো···

বাতোয়ালা সত্যি সত্যি ঠিক এইরকমই মনে মনে জল্পনা করে চলেছিল···বিসিবিংগুই অনুমান করতে ভুল করে নি। বাইরের অন্তরঙ্গতার আড়ালে নিঃশব্দে বয়ে চলে প্রতিহিংসার ধারা—

"বাবা, তুমিই প্রকৃত সুখী,
আমরা যারা শোকার্ত পড়ে রইলাম,
আমরাই আসলে দুঃখী।"

একটা ছোট ছেলে আপনার মনে একটা বহুরূপী গিরগিটি ধরবার চেষ্টা করছে। ওরা তাকে বলে কলিঙ্গো। কলিঙ্গো যেখানে থাকে, তারই রঙ ধারণ করে, কখনো শাদা, কখনো হল্‌দে, কখনো সবুজ।

কিন্তু বাতোয়ালার কুকুর, জুমা, সে কি এই তত্ত্ব জানে? না। এ তত্ত্ব জানবার কোন উপায়ই তার নেই। তাই কান

খাড়া করে সে বহুরূপীটির দিকে চেয়ে প্রাণপণে চীৎকার করে।

শববাহীরা ধীরে ধীরে বৃদ্ধের শবদেহকে একটা মাদুরের ওপর তুলে নেয়, যে-মাদুরে বৃদ্ধ শুয়ে থাকতো। তারপর কবরস্থানে নিয়ে যাবার জন্যে কাঁধে তোলে। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল শব্দে বাজনা বেজে ওঠে। মেয়েরা কণ্ঠ ছেড়ে বিলাপ করতে আরম্ভ করে,…

"ওগো বৃদ্ধ,
আজ এখন আমরা চলেছি,
তোমাকে নিয়ে যাব তোমার নতুন ঘরে।
এখানকার জীবন ছেড়ে চলে যেতে
হলো বলে দুঃখ করো না।
তুমি যে নতুন দেশে যাচ্ছো,
সেখানে তুমি ঢের সুখে থাকবে।
সেখানে তোমার অন্নের অভাব হবে না,
অভাব হবে না পানীয়ের।
সেখানে প্রয়োজনই হবে না খাদ্যের।
কারণ সে-দেশে নেই ক্ষুধা, নেই তৃষ্ণা।"

কয়েক গজ দূরে কবরের মাটি খোঁড়া হয়েছে। শবযাত্রীর দল গাইতে গাইতে সেখানে উপস্থিত হয়। ধীরে মাটির তলায় গর্তের ভিতর শব-দেহকে নামিয়ে দেওয়া হয়। নির্বিঘ্নে ঘুমাবে এবার বৃদ্ধ।

কবরের পাশে, বৃদ্ধের যা কিছু কাপড়-চোপড়, আসবার-পত্র ছিল সব এক জায়গায় এনে জড় ক'রে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। পৃথিবীর সঙ্গে তার সব সম্পর্ক গেল ফুরিয়ে।

একে একে শোকের পালা শেষ হয়ে এলো। বৃদ্ধের মৃত-দেহকে কবরে সমাহিত করবার পর, সেইখানেই বৃদ্ধের পার্থিব অবশিষ্ট যা কিছু ছিল, সব আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হলো।

মেয়েরা গাইতে গাইতে যে-যার ঘরে ফিরে গেলো,

"তুমি এখন পৌছে গিয়েছো,
ঘন অন্ধকার ঝোপ-জঙ্গল পেরিয়ে
কলিকং বো-দেশে,
যেখানে তোমার অপেক্ষায় আছে
তোমার বংশের পিতা-পিতমহরা,
তাদের সঙ্গে আনন্দে তুমি আজ হয়েছো মিলিত,
আমরাও একদিন সেখানে গিয়ে তোমার
সঙ্গে হবো মিলিত।"

ধীরে নেমে আসে রাত্রি। রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে আসে দুরন্ত হিম।

নদীর ওপারে বনের ভেতর থেকে জেগে ওঠে শার্দুলের চীৎকার...তারা বেরিয়েছে শিকারের সন্ধানে।

রাত্রির অন্ধকার...হিম...আর শার্দুলের নিশীথ গর্জন।

কেটে যায় দিনের পর দিন।

মৃত-ব্যক্তি যে কুঁড়ে ঘরে থাকতো, সে-ঘরের ছাদ ভেঙ্গে ফেলে দেওয়া হয়েছে···ঘরের সামনে যে কাঠের লিঙ্গ-মূর্তি ছিল, সেটা ভেঙ্গে পড়ে গিয়েছে। কোন পরিবারের কর্তা যখন মারা যায়, তখন এইভাবেই তারা তার থাকবার ঘরের ছাদটা ভেঙ্গে দেয়। যে-পুরুষ পৃথিবী পরিত্যাগ ক'রে কলিকংবোর দেশে যাত্রা করে, সে তো আর সন্তানের জন্ম দিতে পারবে না, তাই তার ঘরের সামনে কাঠের লিঙ্গ-মূর্তিকেও তারা ভেঙ্গে ফেলে দেয়।

ক্রমশ সকলেই ভুলে যায় তার কথা। জ্যান্ত পৃথিবীর নেশায় মেতে ওঠে আবার তারা।

সামনেই শিকারের সময়। বর্শা-হাতে ছোটে তারা বনের দিকে। তাদের বাজনায় বেজে ওঠে শিকারের গান। সারাদিন ধরে শাণ দেয় বর্শায়। টগ বগ করে নাচতে থাকে শিরায় রক্ত। প্রমত্ত শার্দুলের সঙ্গে হবে তার মত্ত আদর···মৃতের জন্যে বসে বসে শোক করবার সময় আর নেই···চোখের সামনে ভেসে ওঠে রক্তমাখা বুনো-জন্তুর অন্তিম আস্ফালন···পিচ্‌কিরির মতন ছিট্‌কে পড়ে রক্তের ধারা···নিশীথ-অরণ্য কেঁপে ওঠে মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্যে। নেচে ওঠে বুনো মানুষের মন···জীবনের আহ্বানে।

মধ্য-আকাশকে পেরিয়ে বহুক্ষণ হলো সূর্য এগিয়ে চলেছে তার কুঁড়ে ঘরের দিকে, দিগন্ত-রেখার ওপারে অদৃশ্য-লোকে আছে তার দিনান্তে-ফিরে-আসার কুঁড়ে ঘর। আহা, ঐ

আত্মিকালের বত্মিবুড়ো, হাজার হাজার বছরের ঐ বুড়ো-সূর্যি, অমন সুন্দর লোক আর হয় না। এতটুকু অবিচার নেই তার কাছে। তুমি যত বড়ই হও, কিম্বা তুমি যত ছোটই হও, যত কেন না তুচ্ছ হও, সমানভাবে সকলকেই সে দিয়ে চলে আলো। এতটুকু পক্ষপাতিত্ব নেই তার কারুর জন্যেই! সে জানে না কে ধনী, কে নির্ধন! সে জানে না···কে নিগ্রো আর কে শাদা-চামড়া।

গায়ের রঙ শাদাই হোক্ আর কালোই হোক্, ঘরেতে টাকা পয়সা থাকুক আর নাই থাকুক্, তার তাতে কিছু যায় আসে না. আকাশের তলায় সবাই তার সন্তান। সব সন্তানকেই সে সমান ভাবে ভালবাসে। উদয়াস্ত সকলের মন জুগিয়ে চলে। কোথায় কোন ছেলের দল বীজ বুনছে, আলো দিয়ে সেই বীজ থেকে তৈরী করে দেয় অঙ্কুর; কোথায় কারা ভোরে হিমে আর কুয়াসায় পাচ্ছে কষ্ট, তাড়াতাড়ি আলোর শর দিয়ে তাড়িয়ে দেয় কুয়াসার জঞ্জাল; আলোর মুখ দিয়ে শুষে নেয় অদরকারী বাড়তি জল···সারা দুনিয়া থেকে তাড়িয়ে বেড়ায় ছায়া-ভূতের দলকে। ছায়া সে সইতে পারে না।

ছায়া! অন্ধকার! তাদের শত্রু সে, চিরদিনের শত্রু। দয়াহীন, মায়াহীন, নির্মম সে তাড়িয়ে বেড়ায় যেখানে থাকে ছায়া। সারাদিন ছায়ার পেছনে শিকার করে বেড়ায়। এমন ঘৃণা আর কিছুকে সে করে না।

পীড়িত যে, তার বন্ধু সে। তার আলো তাদের ওষুধ। মার স্নেহের মতন আলোর স্পর্শে সে পীড়িতকে দেয় শান্তি। কে না জানে, আলোই স্বাস্থ্য, আলোই পরমায়ু? কে না জানে, ঐ বুড়ো সূর্যের জন্যেই এই জগৎ-ভরা সব প্রাণী জীবন ধারণ করে আছে?

একমাত্র চিরজীবী হলো সূর্য।

মানুষের আয়ত্তের বাইরে, শাসনের বাইরে যা কিছু, সেখানেও সূর্যের আলো গিয়ে পৌঁছোয়, সেখানেও চলে তার শাসন।

এ জগতে চিরদিনের কেউ নয়। প্রত্যেক বর্ষায় যেমন নদীর জল বেড়ে ওঠে, তেমনি বেড়ে চলেছে মানুষ। আজকে যারা শিশু, কালকে আবার তারা হবে শিশুর জনক।

মাটিকে আশ্রয় করে থাকে ঘাস। ঘাসকে আশ্রয় করে থাকে বনের প্রাণী। সেই ঘাস আর বনের প্রাণী, দুই-ই আবার নষ্ট হয়ে যায় মানুষের হাতে। মানুষকেও নষ্ট করে দেয় মৃত্যু। কিছুই থাকে না চিরদিন বেঁচে। কিছু না।

আজ যেখানে রয়েছে কুঁড়েঘর, উঠছে ধোঁয়া নড়ছে ফিরছে প্রাণী, কাল সেখানে গজিয়ে উঠবে বন, ঘন জঙ্গল। আবার মানুষ এসে ছেয়ে ফেলবে সেই বন-জঙ্গলকে। অদৃশ্য হয়ে যাবে বন। শুকিয়ে যাবে নদী। বৃথাই মানুষ আশা করে যে তার সন্তান-সন্ততির মধ্যে সে থাকবে বেঁচে। বড় বড় বংশ

অদৃশ্য হয়ে যায়, লুপ্ত হয়ে যায়, সূর্যের আলোয় লুপ্ত হয়ে যায় যেমন কুয়াসা।

একমাত্র শুধু ঐ বুড়ো সূর্য, লুলু তার নাম, প্রতিদিন সে-ই থাকে বেঁচে, প্রতিদিন সমান তাজা, অক্ষয় তার যৌবন ; আজও আছে, কালও থাকবে, জগতের সব মৃত্যুর ওপর সে শুধু একমাত্র জেগে আছে জীবন্ত প্রহরী। তেমনি সোনার বরণ, তেমনি আলোময়, তেমনি পরোপকারী। একজনকে ছাড়া, বিরাট সৃষ্টিতে সে আর কাউকে ভয় করে না। সে হলো 'আইলু', চাঁদ। চাঁদের আসবার সময় হলেই, সে তাই গা ঢাকা দেয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শিকারের মরশুম। আজ কালো মানুষের দল বর্শা হাতে সবাই বেরিয়েছে জঙ্গলে।

কোসিগাম্বা কাগার একটা সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে বিসিবিংগুই অপেক্ষায় আছে···

অপেক্ষায় ক্লান্ত হয়ে হাই তুলে মাঝে মাঝে স্থান পরিবর্তন করে নেয়।

পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচে চেয়ে দেখে, চোখে পড়ে বাম্বার তীরে গ্রিমারি···হলুদরঙা ছোট্ট একটা ক্ষেতের মতন পড়ে আছে। সেই ছোট্ট ক্ষেতের একধারে, চোখে পড়ে কতকগুলো ঘর···সেই ঘর থেকে যে-আদেশ বেরোয়, সে আদেশ যতই কেন

বিচিত্র হোক্ না, আশে-পাশের সমস্ত কালো লোকদের জীবন তাতে বাঁধা, সে আদেশ মানতে তারা বাধ্য।

ঘন গাছের সারি ভেদ করে তার দৃষ্টি চলে যায় বাম্বার শীর্ণ রেখার ওপর, সেই রেখাকে অনুসরণ করে চলে তার দৃষ্টি। আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে বাম্বা চলেছে গ্রাম ছাড়িয়ে শূন্য মাঠের দিকে।

সেখান থেকে বিসিবিংগুই দেখতে পায়, সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করছে। তাদের কুচকাওয়াজের শব্দে ছুটে পালায় সিবিবিসের দল, খরগোসের চেয়ে ছোট, ইঁদুরের চেয়ে বড়। দল বেঁধে ছুটে পালাতে গিয়ে তারা পাথরে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে যায়, আবার উঠে ছুটতে আরম্ভ করে।

সৈন্যরা মার্চ করে এগিয়ে চলেছে। বাতাসে ভেসে আসে তাদের মার্চের সঙ্গীত। উঁচু থেকে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, তারা এগিয়ে চলেছে, কোসিগাম্বা ছাড়িয়ে···আরো দূরে, বহু দূরে এগিয়ে চলেছে···

বিসিবিংগুই অপেক্ষা করে আছে···হঠাৎ তার নজরে পড়ে, পাহাড়ের তলায় সরু আঁকা-বাঁকা পথের ওপর কে যেন একজন এসে দাঁড়ালো···স্ত্রীলোক···মুখে তামাকের পাইপ, মাথায় একটা চুবড়ী···স্ত্রীলোকটি এগিয়ে আসছে···

বিসিবিংগুই ক্রমশ আরো স্পষ্ট দেখতে পায়···চিনতে পারে ···ইয়াসীগুইন্দজা!

আগের দিন ইয়াসীগুইন্দজার সঙ্গে বিসিবিংগুই-এর হঠাৎ ঐখানে দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে যায়। তার ফলে ইয়াসী কথা দেয়, এইখানেই তার সঙ্গে গোপনে দেখা করবে এবং তার কথামত ঠিক নির্দিষ্ট সময়েই সে এসে হাজির হয়েছে।

দূর থেকে তার পোষাক দেখেই বিসিবিংগুই মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে! প্রত্যেক মাসে আটদিন। এই সময়টা তাদের মেয়েরা পোষাকের মধ্যে একটা বিশেষ পরিবর্তনের চিহ্ন ধারণ করে। কপাল ঘিরে মাথায় বাঁধা থাকে একটা লাল সূতো; চুল থাকে এলোনো। এই আটদিন তারা চুলে চিরুনী দেয় না। প্রকৃতির নিষেধ বলে এই চিহ্নকে তারা সম্মান করতে জানে। সেই নিষেধের বিজ্ঞাপন ক্ষুব্ধ করে তোলে অপেক্ষমান বিসিবিং-গুই-এর কামাতুর মন।

ইয়াসীগুইন্দজা কাছে এসে বসে। নীরবে বিসিবিংগুই তাকে অভ্যর্থনা জানায়।

আপাতত এখন তাদের ভয় করবার কিছুই নেই। গাঁয়ের প্রত্যেক লোক এখন শিকারে ব্যস্ত, উন্মত্ত। সব গাঁ খালি করে পুরুষ নারী সবাই বেরিয়ে পড়েছে বনে জঙ্গলে। ঘরে ঘরে শুধু পড়ে আছে যারা বৃদ্ধ, যারা রুগ্ন অশক্ত, যারা অন্ধ, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আর সদ্য-প্রসূতা নারীরা…আর আছে গৃহপালিত ছাগল আর মুরগীর দল। কুকুরগুলোও যে-যার মনিবের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে জঙ্গলে। সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ।

বিসিবিংগুই পার্শ্বোপবিষ্ট নারীর দিকে তপ্ত আগ্রহে চেয়ে দেখে। মনে হয়, তার সারা দেহের মধ্যে যে সব দড়ি আছে, যে নীল দড়ির ভেতর দিয়ে রক্ত-ধারা ছুটে চলে, বাইরের এই সূর্যের আলো যেন সেই নীল দড়ির ভেতর ঢুকে পড়েছে, তার তপ্ত আলো সেখানকার রক্ত-ধারাকে উত্তপ্ত করে তুলেছে।

বিসিবিংগুই মুগ্ধ বিস্ময়ে ইয়াসীর দিকে চেয়ে থাকে। ইয়াসীও নীরবে তার বলিষ্ঠ দেহকে দৃষ্টি দিয়ে লেহন করে। সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ, পুরুষালি সৌন্দর্যে ভরা। দু'দিকে কাঁধ সুন্দর রেখায় উঁচু হয়ে আছে, বক্ষপেশী সুকঠিন মাংসে সমুন্নত, সরু কোমর, পেটের চিহ্ন নেই বলতে গেলে, তামার পাতের মতন পাতলা, দীর্ঘ দুটি পা, পাথরের মতন শক্ত, পরিপুষ্ট। সবাই জানে বনের নেকড়েকে সে দৌড়ে গিয়ে ধরে।

ইয়াসীগুইন্দজা আশে-পাশের অনেক মেয়েদের কথা জানে, যারা বিসিবিংগুই-এর আদরের জন্যে কত কান্নাকাটি করেছে, এমন কি তার কাছ থেকে কত অপমান আর কত নির্যাতন নীরবে সহ্য করেছে।

আপনার মনে ইয়াসী তার দুঃখের কাহিনী তাকে বলে চলে। বাতোয়ালার বৃদ্ধ পিতার সেই আকস্মিক মৃত্যু নিয়ে গাঁয়ে রীতিমত পঞ্চায়েৎ বসে! ওঝারা এসে ঘোষণা করে, কোন দুষ্ট লোকের মারণ-ক্রিয়ার ফলেই বৃদ্ধ মারা গিয়েছে। সমাজের ভেতর এমন দুরভিসন্ধি-ওয়ালা কোন্ লোক আছে, তাকে খুঁজে

বার করতে হবে। এই লোককে ধরবার জন্যে, তাদের নানা রকমের পরীক্ষা আছে। ইয়াসী বলে, হায়! বুড়ো ওঝা নাকি বলেছে, আমারই চক্রান্তে বাতোয়ালার বাবা মারা পড়েছে। আমিই তার ঘাড়ে চাপবার জন্যে ভূত পাঠিয়েছি। তাই আমাকে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্যে নানান রকমের বিষ-পরীক্ষা দিতে হবে।

কাতরভাবে বিসিবিংগুই-এর হাত জড়িয়ে ধরে সে বলে, বিসিবিংগুই একমাত্র তুমি আমাকে বাঁচাতে পার! তুমি শক্তিমান! ওদের হাত থেকে তুমিই আমাকে বাঁচাতে পার! দোহাই তোমার, বাঁচাও আমাকে! বাঁচাও আমাকে বাতোয়ালার আক্রোশ থেকে···

ইতিমধ্যেই ওঝাদের পরীক্ষা সুরু হয়ে গিয়েছে। একটি পরীক্ষায় অবশ্য সে উত্তীর্ণ হয়েছে।

সেদিন তার সামনে ওঝারা মন্ত্র পড়ে একটা কালো মুরগীর ছানার গলা কেটে ছেড়ে দেয়। মুরগীর ছানাটা লট্‌পট্‌ করতে করতে, সৌভাগ্যবশত বাঁদিকে এসে অসাড় হয়ে পড়ে রইলো। যদি ডান দিকে এসে পড়তো, তা হলেই সাব্যস্ত হয়ে যেতো যে সে দোষী।

ওঝারা বল্‌লো, তা হলে ইয়াসীগুইন্দ্‌জা এ ব্যাপারে দোষী নয়···অন্য কোন লোকের কাজ।

কিন্তু গাঁয়ের বুড়োরা অত সহজে ওঝাদের কথায় সায় দিলো

গাঁ, তারা কি পেরেছে পাম্বা আর বাম্বার মিলনকে বাধা দিতে? সমস্ত বন, পাহাড়, জঙ্গলের বাধা এড়িয়ে নদীর জল ঠিক এসে মিশবে আর এক নদীর সঙ্গে···তুমি আমাকে কতখানি ভালবাস, তা আমি জানি না, কিন্তু আমি বলছি তোমাকে, এই ক'দিন কেটে গেলেই আমি এসে মিলবো তোমার সঙ্গে। বিসিবিংগুই, তুমি আমার, তুমি আমার!"

বন্য নারীর অন্তরে দুরন্ত ঝর্ণার বেগে নেমে আসে কামনার ঢল। বাসনা আর বাঞ্ছিতের মাঝখানে কোন বাধাকেই সে স্বীকার করে না।

সেদিন মেঘে ঢাকা থাকার দরুণ সূর্যের তেজ তেমন জোরালো ছিল না।

ইয়াসীগুইন্দজা তার প্রাণের সমস্ত গোপন আকুতি বিসিবিংগুই-এর কাছে নিবেদন করে সমর্থনের জন্যে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু সেখানে সমর্থনের চিহ্ন সে দেখতে পায় না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্ষুব্ধ অন্তরে বলে, তাহলে তুমি সত্যি আমাকে ঘৃণা করো? কিন্তু আমি কি করবো? আমি যে নিরুপায়। স্ত্রীলোকের রক্তের ওপর ঐ আকাশের চাঁদ যে প্রভাব বিস্তার করে, তুমি তো জান না, তা রোধ করবার ক্ষমতা মেয়েদের নেই! তাই আমার সরল প্রাণের উচ্ছ্বাস শুনে হয়ত তুমি মনে মনে হাসছো···কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি শুধু তোমাকেই ভালবাসি!

তবু বিসিবিংগুই তার কথায় কোন সাড়া দেয় না। সহজ পথ ছেড়ে দিয়ে তখন নারী তার গোপন অস্ত্র প্রয়োগ করতে স্থুরু করে। সেখানে সব দেশেই তারা সমান।

ইয়াসীগুইন্দজা বলে, বুঝেছি, বাতোয়ালার ভয় করছো তুমি!

—বিসিবিংগুই অট্টহাস্য করে ওঠে।

ইয়াসী বলে, চল আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই···এই মুহূর্তে। তোমার কোন ভাবনা ভাবতে হবে না, আমি তোমার জন্যে নতুন ঘর তৈরী করবো, তোমার ঘর-দোর পরিষ্কার করে রাখবো···তোমার জন্যে মাঠে গিয়ে জমিতে চাষ করবো, তুমি খাবে বলে নিজের হাতে শস্য কেটে ঘরে নিয়ে আসবো! বিসিবিংগুই অমন করে তুমি হেসো না। তুমি বুঝতে চেষ্টা করো, চাঁদের আলো যদি একবার আমাদের রক্তে এসে লাগে, আমরা অসহায় কতখানি। আমি কি করে নিজেকে ধরে রাখবো বলো? আমার রক্ত যে ভেতর থেকে আমাকে টেনে আনছে তোমার কাছে!

বিসিবিংগুই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, হাঁ, যাবো!

ইয়াসী বলে, যাবো নয়, এক্ষুনি চলো···তোমার ভয় কি? তুমি বাংগুই শহরে সেখানকার শাদা ক্যাপটেনের কাছে সোজা চলে যাবে···তোমার বয়স কম···মজবুৎ তোমার চেহারা···এমন চেহারা কোন সৈনিকের নেই···হায় বিসিবিংগুই, তুমি বিশ্বাস

করো, এমন চেহারা কারো নেই! একবার তুমি তুরুগুং(সৈন্য) হলে আর তোমাকে কোন কালো আদমী ছুঁতে পারবে না, তোমার বিরুদ্ধে তখন কোন নালিশই টিকবে না, এমন কি বাতোয়ালারও নয়! দোহাই তোমার আমাকে বাঁচাও! আমি কিছুতেই বিষ মুখে নিতে পারবো না, কিছুতেই পারবো না ফুটন্ত জলে হাত ডুবিয়ে মরতে! আমার যৌবন এখনো রয়েছে ভরা, আমি বাঁচতে চাই। আর বাঁচতেই যদি হয়, তাহলে যাকে আমার মন চায় তার সঙ্গে না থাকলে বাঁচারই বা কি মানে থাকে?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আকাশের রঙ কখন ধীরে ধীরে বদলে এসেছে। সূর্যদেবের রক্ত-রাঙা নৌকা তখন দিগন্ত-রেখার পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ডুবে যাচ্ছে। চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। ঠিক এমনি নিস্তব্ধতা প্রতিদিন মাত্র দুবার করে দেখা দেয়, একবার যখন সূর্য ওঠে, ঠিক তার আগে, আর একবার যখন সূর্য ডুবে যায়, ঠিক্ তার আগে।

বিসিবিংগুই উঠে দাঁড়ায়। সমস্ত দেহটাকে টেনে ঠিক করে নেয়। ইয়াসীর দিকে চেয়ে বলে, তুমি যা বল্লে, তার একটা কথাও আমি অবিশ্বাস করি না। তবে আজ নয়, আমাকে একটু ভেবে দেখতে দাও! নাঙ্গাকৌরার শপথ নিয়ে বলছি, আমি

তোমার কথা ভুলবো না। যাবো, তোমাকে নিয়ে যাবো। তবে তার সময় এখনো আসে নি। শিকারের পর্ব শেষ হয়ে যাক। বাতোয়ালার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া বাকি আছে। তার মাঝখানে তুমি এসো না। শিকারের পর্ব শেষ হোক···তখন আমি ব্যাংগুই শহরে যাবো···নিশ্চয়ই যাবো···আমার অনেক দিনের সাধ, আমি তুরুগু হবো···আপাতত তাই চললুম এখন ইয়াসীগুইন্দজা !

ইয়াসীগুইন্দজা প্রার্থনা জানায়, নির্বিঘ্ন হোক তোমার পথ !

দাঁড়িয়ে দেখে, বিসিবিংগুই ধীরে ধীরে পাহাড়ের পথের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো। মাথার ঝুড়ি মাথায় তুলে নিয়ে ইয়াসীগুইন্দজা অন্য পথ ধরে নীচে নামতে স্বরু করে।

তখন ধীরে ধীরে প্রান্তরভূমিকে ছেয়ে নেমে এসেছে ধূসর সন্ধ্যা···তারায়-ভরা সন্ধ্যা। বাতাসে আল্‌গা দুলছে বনফুলের সুরভি। অন্ধকারের ফ্রেমে-আঁটা জ্বলন্ত বনের লাল ছবি। আকাশে উঠেছে কাস্তের মত বাঁকা চাঁদ, এক ফালি আলো। কাছাকাছি গভীর ঘন নীলের অগাধ বিস্তারে দপ দপ করে জ্বলছে শুধু একটা তারা।

চারদিকে প্রশান্ত সৌন্দর্য···স্নিগ্ধ সুকোমল আলো···দেখলেই মনে হয় এই পরিবেশের মধ্যে অন্যায়ের, অসুন্দরের, অমঙ্গলের যেন কোন স্থান নেই।

কিন্তু তার ভেতর থেকে মাঝে মাঝে কানে এসে পৌঁছায়

ডুগডুগীর আওয়াজ, লিংঘার গুম্ গুম্ শব্দ···মনে হয় অন্ধকারে যেন আস্ফালন করছে কোন্ দুরন্ত প্রাণী···মহা-প্রশান্তির অন্তরে গুমরে উঠছে চির-দুর্বিনীত অশান্ত···

অষ্টম পরিচ্ছেদ

স্থানীয় কালো লোকদের কাছে তুরুগু হওয়ার একটা প্রবল আকর্ষণ থাকে। বিসিবিংগুই সেই আকর্ষণে মত্ত হয়ে উঠেছিল।

তারা বলে তুরুগু, শাদা লোকগুলো বলে মিলিটারীম্যান। সৈনিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি পাবে রাইফেল, টোটা, চামড়ার বাকস্ ভর্তি টোটা···বুকের সঙ্গে থাকবে আঁটা···কোমরে ঝুলবে লম্বা একটা ছুরি···রীতিমত ধারালো ছুরি। পায়েতে উঠবে জুতো···রীতিমত শক্ত চকচকে চামড়ার জুতো···কাঁধেতে থাকবে তামার তক্মা···তার ওপর, রীতিমত মাসে মাসে পাবে মাইনে।

প্রত্যেক রবিরার, ক্যাপটেন সবাইকে ডেকে বলে দেবে ছুটি; তখন সেই পোষাকে রাইফেল উঁচিয়ে গাঁয়ের ভেতর গিয়ে যখন ঢুকবে, চারদিক থেকে মেয়েরা আসবে ছুটে···ঘিরে দাঁড়াবে তোমাকে···সকলের দৃষ্টি থাকবে তোমার ওপর···শুধু তোমারই ওপর।

এ সব সুবিধে তো হাতে-হাতে সামনা-সামনিই পাওয়া যায়, তাছাড়া পেছন দিক থেকে আরো আছে হাজার মজা। তরুগু হলে তোমাকে আর ট্যাক্স দিতে হবে না, উল্টে তুমিই

লোকের কাছ থেকে আদায় করে নিয়ে আসবে ট্যাক্স। তোমার খাতির কত ?

যে সব গাঁয়ের ট্যাক্স বাকি পড়বে, বাকি পড়বেই কোন না কোন গাঁয়ের, তোমারই ওপর হুকুম হবে তাদের জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে আসবার···সেই সঙ্গে আশে-পাশে দু' এক ঘর যারা হয়ত ট্যাক্স দিয়েছে, লুটের হাত থেকে তারাও বাঁচবে না। লুটের মাল কি সবই সরকারের সিন্দুকে যাবে ? মোটেই না।

তুরুগুদের ওপরই ভার পড়বে, রবার সংগ্রহ করে নিয়ে আসবার। তারাই জোগাড় করবে রবারের ঝুড়ি বইবার লোক। এই তো হলো তুরুগুদের কাজ। তাদের সঙ্গে গোপন খাতির রাখবার জন্যে বড় বড় সর্দাররা পর্যন্ত উপহার, বক্‌শিস নিয়ে ছুটে আসবে। কারুর সাধ্যি নেই তুরুগুদের চটায়। তা ছাড়া, তুরুগুদের মাথার ওপর যে শাদা সেনা-নায়ক থাকে, সে তাদের ভাষা জানে না। সেটা কম সুবিধে ? তুরুগুরা যা বোঝাবে, শাদা ক্যাপটেনরা তাই শুনতে বাধ্য। সেটা কি কম সুবিধের কথা ? ধর, তারা এসে ক্যাপটেনকে খবর দিলো, অমুক গাঁয়ের লোকেরা ভয়ানক অবাধ্য হয়েছে···যা হোক একটা গল্প বানিয়ে বলতে কি আর কষ্ট ! ক্যাপ্‌টেন অক্ষরে অক্ষরে তাদের কথা বিশ্বাস করে, হুকুম দেয় গ্রেফ্‌তার করো ! তখন তুরুগুরা রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে এবং গাঁকে গাঁ গ্রেফ্‌তার করে নিয়ে আসে, ছাগল, মুরগী, মানুষ, ছেলেপুলে, স্ত্রীলোক সবশুদ্ধ গ্রেফ্‌তার

করে নিয়ে আসে। এমন কি, যার যার গোলায় যা কিছু শস্য মজুৎ থাকে, তাও বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে আসে।

বিচার হয়···অনেক সময় বিচারের ফলে গ্রেফ্‌তারী মাল নীলামে বিক্রী হয়ে যায়···মুরগী, ছাগল আর গমের দানার সঙ্গে নীলামে স্ত্রীলোক আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েও বিক্রী হয়ে যায় ···সেই বিক্রয়-লব্ধ অর্থ ট্যাক্‌স হিসাবে সরকারী তহবিলে জমা পড়ে।

অনেক সময় গ্রেফ্‌তারী মুরগী আর ছাগল, তুরুগুরা নিজেদের মধ্যেই ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়। কেউ কেউ আবার সেই সব মুরগী আর ছাগল খোদ বড়কর্তাকে উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দেয়। বড়কর্তা এই সব প্রীতির নিদর্শন স্মরণ করে রাখেন, প্রমোশন দেবার সময়।

সুতরাং তুরুগু হওয়ার প্রলোভন কালো নিগ্রোদের কাছে কম প্রবল নয়। তাই বিসিবিংগুই-ও মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল, সে-ও তুরুগু হবে···

অন্ধকার রাত্রির মধ্যে সেই কথা ভাবতে ভাবতে বিসিবিংগুই একা এগিয়ে চলে···

পিঠে ঝোলান ধনুক, তূণ-ভর্তি বাণ, হাতে লম্বা একটা বর্শা ···আলাদাভাবে তৈরী বিরাট বর্শা···একটার জায়গায় তিনটে ফলক। দুই কোমরে গোঁজা দুটো লম্বা ছোরা···ছুঁড়ে মারবার ছোরা। পিঠে ঝোলানো পেট-মোটা একটা থলে···খাবারে

ভর্তি। বাঁ হাতের অপর দিকে চামড়ার তাগায় বাঁধা আর একটা ছোরা।

বিসিবিংগুই এগিয়ে চলে অন্তহীন ঘন অন্ধকারের ভেতর দিয়ে···শঙ্কাহীন শান্ত পদক্ষেপে, ধীরে। কিন্তু বিন্দুমাত্র শব্দ হলে, চমকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, চোখ আর কান খাড়া হয়ে ওঠে তার। হাতে জ্বলন্ত একটা মশাল। কতক্ষণ এইভাবে সে চলেছে? তার কোন আন্দাজ তার নিজেরই ছিল না। সময়কে ঘণ্টায়, মিনিটে, সেকেণ্ডে ভাগ করে দেখবার কায়দা তারা জানে না। সে কায়দা জানে একমাত্র শাদা মনিবেরা। তারাও আবার আন্দাজে তা জানতে পারে না। তার জন্যে তারা একটা ছোট বাকুসের মত যন্ত্র ব্যবহার করে, তার ভেতরে ছোট ছোট সূঁচের মত দুটো কি তিনটে করে কাঁটা থাকে, সেই কাঁটাগুলো নম্বর-দেওয়া ঘর ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে, তাই থেকে তারা নাকি বুঝতে পারে কতটা সময় কেটে গেল।

বিসিবিংগুই এগিয়ে চলে···সামনেই পড়ে একটা ছোট্ট গাঁ, কোসিগাম্বা কাগা, তার পাশে ছোট্ট একটা নদী বোবো, কতদিন এই নদীর জলে অনায়াসেই না সে সাঁতার কেটেছে। এসে পড়ে বড় রাস্তায়, সে-রাস্তা চলে গিয়েছে শান্ত্রীদের পাহারা-ঘরের দিকে; আরো একটু এগিয়ে এসে পড়ে পাঁচিল-ঘেরা একটা বিরাট জমিতে, সেখানে শাদারা তাদের মড়াদের কবর দেয়; ক্রমশ দেখা দেয় বাম্বা; বাম্বার ওপরে সাঁকো; সাঁকো

পেরিয়ে কমাণ্ডারের ঘাঁটি···তার চারপাশে চাষের জমি, কমাণ্ডারের শাক-সজীর বাগান ; তার একধারে একটা মস্ত বড় ছাউনী, যেখানে রবারের বেচা-কেনার সময় সর্দ্দাররা আর তাদের লোকজন এসে জড় হয়।

আরো এগিয়ে যায়। পোম্বোর তীর ধরে এগিয়ে চলে। বাতোয়ালার গাঁয়ের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলে, নির্জন মাঠের মাঝখানে একটা কুঁড়ে ঘর···সেইখানে গিয়ে থামে। সেই অঞ্চলের জেলে মাকুদে সেইখানে বাস করে, তারই কুঁড়ে ঘর।

মাকুদের কাছে সে জানতে পারে, বাতোয়ালা এখন কোথায় আছে। সেই সন্ধান নিয়ে সে আবার বেরিয়ে পড়ে। বেরুবার মুখে মাকুদে তাকে সাবধান করে দেয়···কি এক মহা-অনর্থের সম্ভাবনা ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয়। সেই ইঙ্গিতের অস্পষ্টতা থেকেই বিসিবিংগুই বুঝতে পারে, তার জীবন কতখানি বিপন্ন। বাতোয়ালা প্রতিহিংসার জন্যে ক্ষিপ্ত হায়েনার মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আর বিলম্ব করা উচিত নয়। বাতোয়ালা কিছু করবার আগেই, তাকে তার কর্তব্য শেষ করে ফেলতে হবে। যত শীঘ্র সম্ভব।

সে নিমন্ত্রণ পেয়েছে, বিশেষ নিমন্ত্রণ বাতোয়ালার কাছ থেকে। একবার ভাবে, সে-নিমন্ত্রণ যদি সে গ্রহণ না করে? তারপর ভাবে, যদি অনুপস্থিত থাকে, লোকে অন্য রকম ভাবতে

পারে। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেই যদি যায়, তাতে কি যায় আসে? সেখানে তার এমন কি বিপদ হবে? বাতোয়ালার আপনার লোকজনের মধ্যে বাতোয়ালার সামনা-সামনি হওয়া কি যুক্তি-সঙ্গত? এক পা ভুল ফেললেই, সব গোলমাল হয়ে যাবে।

হঠাৎ উত্তর দিক থেকে হাওয়া এসে গায়ে লাগে। শুভ লক্ষণ। বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসে মাদলের গুরু-গম্ভীর আওয়াজ···আগুনে পোড়া কাঠ ফাটছে, তার শব্দ···লিংঘার ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি।

তাকে একটা যা হোক সিদ্ধান্ত করতে হবে। হয় মারতে হবে, নয় মরতে হবে। কিন্তু সে মারবে কি করে? কোথায়? কখন?

এগিয়ে চলে। মন্দ লাগে না! মাদলের আওয়াজ স্পষ্টতর হয়। একদল বাদুড় উড়ে চলে গেলো। প্যাঁচা ডাকছে। জোনাকীরা জ্বলছে। দূরে, সামনেই চোখে পড়ে আগুন। মাথার ওপরে আকাশ তারায় তারায় ভরা। শিশির পড়ছে। টুপ্ টাপ্, টুপ্ টাপ্।

চমৎকার! চমৎকার রাত্রি!

তাতো হলো, কিন্তু···কি সিদ্ধান্ত সে ঠিক করলো? আজকের রাত্রিতেই কি সে খুন হয়ে যাবে? না, না, তা হতে পারে না। চারদিকে সাক্ষী রেখে কেউ কাউকে খুন করে না।

সে কথা ঠিক। সে সম্বন্ধে আর কোন ভুল নেই। কিন্তু,

তার নিজের দিক থেকে, বাতোয়ালাকে কি করে সে সাবাড় করবে ?

হুঁ! একটুখানি বিষ, সেঁকো বিষ। খাবার সময় বাতোয়ালার খাদ্যে যদি মিশিয়ে দিতে পারে! অবশ্য অন্য পন্থাও নিতে পারে, নেকড়ে যে পন্থা নেয়, তার একটা আলাদা আকর্ষণও আছে। কিন্তু তাতে একটা অসুবিধা থেকে যায়, প্রমাণ থেকে যেতে পারে। কিন্তু সেঁকো বিষ···সোজা···কোন প্রমাণ থাকে না।

পাছে অন্ধকারে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে, কিংবা কোন বড় নুড়িতে হোঁচট লাগে, তাই মাটির দিকে মাথা করে এগিয়ে চলে···

হাতের মশাল নিভে গিয়েছে···অন্ধকারে ফেলে দিয়েছে।

গাঁয়ের চারদিকে বনের শুকনো পাতা আর শুকনো ঝোপে তারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। গোল হয়ে আগুনের শিখা ওপরের দিকে উঠছে। তার আঁচ এসে পড়ছে সামনের পথের ওপর।

সে শুধু ভাবে, একটি মাত্র চিন্তা, কি করে সে বাতোয়ালাকে বধ করবে! বধ তাকে করতেই হবে। অরণ্যের নিয়ম। নইলে তাকে নিহত হতে হবে।

অপেক্ষা করে থাকবে সুযোগের জন্যে ? না। সময় দেওয়া চলবে না। ইচ্ছে করে বাতোয়ালাকে ক্ষেপিয়ে দেবে ?

তাই করতে হবে! কিন্তু···কি করেই বা সেটা করা যায়? ভাবনার কথা।

কিন্তু মারতেই হবে। নইলে মরতে হবে। মরার চেয়ে মারা ঢের ভাল। এই অল্প বয়সে পরিপূর্ণ যৌবনের মধ্যে কে মরতে চায়? জীবনে আজও রয়েছে পরিপূর্ণ মধুর স্বাদ এবং নারীরা স্বেচ্ছায় সে-মাধুরীকে করে তোলে মোহনীয়। না, না, সে কিছুতেই মরবে না।

চারদিকে একবার চেয়ে দেখে। চারদিকে আগুন। গাঁ যেন মশালের মতন জ্বলছে।

সে সঙ্কল্প স্থির করে ফেলে, বাতোয়ালাকে সে হত্যা করবেই।

ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে! শীকারের সময়! শীকারের সময় দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে! এ-রকম দুর্ঘটনা তো শিকারের সময় প্রায়ই হয়···তার জন্যে কে আর মাথা ঘামায়?

চমৎকার ব্যবস্থা! শিকারকে লক্ষ্য করে বাণ ছুঁড়ছি···বিষ-মাখা বাণ···লেগে গেলো একজন মানুষের গায়! ভবিতব্যতা! সব মানুষই যে তীর ছোঁড়ায় অভ্রান্ত হবে, এমন কোন কথা নেই! সকলের তাক্ সমান হতে পারে না! সবচেয়ে যে ভাল তীরন্দাজ, তারও তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়! যায় না? তবে?

আর ঐ দাবানল!

প্রত্যেক বছরই কত হতভাগা এই বুনো আগুনে পুড়ে মরে!

আগুনের তো কোন বিচার শক্তি নেই! তার খাদ্যাখাদ্য বিচারও নেই! মানুষ কি গাছ, কাকে পোড়াচ্ছে সে কথা ভেবে দেখবার তার কোন প্রয়োজন নেই। বনের ভেতর হয়ত কেউ নেশায় ঘুমিয়ে পড়েছে···গভীর ঘুম···চারদিক থেকে আগুন এসে তাকে বেষ্টন করেছে···ব্যস্! আগুন কাউকেই রেহাই দেয় না কিছুকেই নয়···একমাত্র শুধু জলকে···

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো কি? হয় একটা বুনো-আগুন, না হয়, শিকারের সময়।

কিসের যেন শব্দ হলো? সে থমকে দাঁড়ায়। সন্ধ্যার পর অন্ধকারে পথের প্রত্যেকটা বাঁক মারাত্মক···প্রত্যেক বাঁকের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে মৃত্যু! সাবধান হতে দোষ কি? যার বুদ্ধি থাকে, সেই সাবধান হয়।

ইস্, একটা পিঁপড়ের ঢিপি! তার ডানদিকে সারি সারি আরো অনেক ঢিপি। তাহলে ডানদিকেই যেতে হবে! লক্ষণ!

কয়েক পা এগুতেই দেখে, কাঁধ বরাবর একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়েছে, বাঁ দিকে···পায়ের কাছে একটা কাঠ, হাঁ, সেটাও বাঁ দিকে···একটা ঝোপ···সেটাও বাঁ দিকে···তাহলে এবার বাঁ দিকেই যেতে হবে। অরণ্যের এই সব ইঙ্গিত জানা চাই। অরণ্য কথা বলে। সারাদিন ধরে বৃদ্ধা পিতামহীর মতন অরণ্য কত কথা বলে! শাদা লোকরা তার কিছুই জানে না। তারা মনে করে, অরণ্য বুঝি মৃত। কি ভুলই না তাদের!

মাথার ওপরে একটা পাখী ডেকে গেল···আকাশে আগুনের শিখা ডানদিকে হেলছে, না বাঁ দিকে হেলছে? গাছের শুকনো পাতা তোমার ডানদিকে পড়লো, না বাঁ দিকে পড়লো···গাছের দু'টো ডাল একটার ঘাড়ে আর একটা এসে পড়েছে···পথ চলতে একটা গাছের ডাল মাথায় এসে লাগলো···শুকনো পাতা উড়ে এসে পড়লো···এ-সবের প্রত্যেকের একটা করে আলাদা মানে আছে···যারা জানে, তারা বুঝতে পারে বনের এই মূক ভাষা। অরণ্য-ভরা কথা···জীবন্ত কথা! মার মতন স্নেহে তাই নির্বাক ভাষায় রাত্রি-দিন অরণ্য আমাদের সতর্ক করে দিচ্ছে···

বিসিবিংগুই পথ চলে আর ভাবে, কি করে, কখন, কোথায়, বাতোয়ালার সঙ্গে সে শেষ-মীমাংসা করবে!

ক্রমশ সে বাতোয়ালার আস্তানার কাছ-বরাবর এসে উপস্থিত হয়। কানে আসে কুকুরের ক্রুদ্ধ চীৎকার। চোখে পড়ে মশালের আলো। স্পষ্ট হয়ে ওঠে দুটো কণ্ঠ, সুরায় জড়িত। বাতোয়ালা আর তার বৃদ্ধা মা। কুকুরটা আর কেউ নয়, জুমা, বাতোয়ালার কুকুর।

বিসিবিংগুই-এর তন্দ্রা ভেঙে যায়। বুঝতে পারে, সে এসে পড়েছে।

কিন্তু মনের মধ্যে তখনও চলেছে সেই ভাবনা। দুটো প্রশ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, শিকারের সময় দুর্ঘটনা, না, বুনো আগুন? বাতোয়ালাকে হত্যা করবার জন্যে কোন্‌টির আশ্রয় সে নেবে?

কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে যায়, আঘাত করার চেয়ে সেই মুহূর্তে, তার কাছে ঢের বেশী প্রয়োজনীয় আত্মরক্ষার ব্যবস্থার কথা ভাবা। চারদিক থেকে নানা রকমের লক্ষণ তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল কিন্তু সে কোন লক্ষণকেই মানে নি, ভাবনার ঘোরে সে শত্রুর ডেরার মধ্যেই এসে পড়েছে। হয়ত তার জন্যে তৈরী ফাঁদে সে নিজেই এসে পা দিয়েছে। সুতরাং এখন আত্ম-রক্ষার ব্যবস্থার কথাই ভাবা তার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ।

অচিরকালের মধ্যেই বিসিবিংগুই বুঝতে পারে, ঝোঁকের মাথায় কি নির্বুদ্ধিতার কাজই সে করে ফেলেছে! এরকমভাবে বাতোয়ালার ডেরায় তার আসা উচিত হয় নি।

তার সামনে বাতোয়ালা, সুরায় উন্মত্ত হয়ে আছে। যে কোন আঘাতের জন্যে তৈরী। হয়ত তাকে বধ করবার জন্যে যে ফাঁদ বাতোয়ালা পেতে রেখেছে, তার মধ্যে সে নিজেই এসে পড়েছে। এসব কথা আগে থাকতেই তার ভেবে দেখা উচিত ছিল। এখন ভাববার সময় নেই।

যদি সেইখানেই বাতোয়ালা তাকে হত্যা করে? সাক্ষী থেকে যাবে? কি করে? সাক্ষীর মধ্যে তো দুটী প্রাণী বাতোয়ালার বুড়ো মা, আর তার কুকুর। কিন্তু সাক্ষী হিসাবে দুজনেই নিরর্থক। কোন মূল্য নেই তাদের অস্তিত্বের। কোন মা তার নিজের ছেলেকে ধরিয়ে দেয় না, যদি ছেলে তার বেজন্মা না হয়। আর জুমা? আজও পর্যন্ত কেউ কখনো শোনে নি

যে, কুকুর কথা বলেছে। অতএব, তাদের দুজনের থাকা আর না-থাকায় কিছুই যায় আসে না।

অতএব বিসিবিংগুই, আজ রাত্রি তোমার জীবনের শেষ রাত্রি। স্পষ্ট করে দু'চোখ চেয়ে আশে-পাশের পৃথিবীকে ভাল করে দেখে নাও!

মাটির ওপরই বসে পড়লো। পাশে মাটিতেই বর্শাটি পুঁতে রাখলো, কোমর থেকে ছোরাটা আল্‌গা করে নিলো।

অতিথি সৎকারে বাতোয়ালার ত্রুটী হয় না। বিসিবিংগুইকে খেতে দেয়। সঙ্গে দেয় ভুট্টা-দানার বিয়ার। বিসিবিংগুই গ্রহণ করে না! খাদ্যও নয়, বিয়ারও নয়। প্রত্যাখ্যানে বাতোয়ালা অসন্তুষ্ট হয়···মুখ ভার করে থাকে। বিসিবিংগুই ইচ্ছে করেই তা লক্ষ্য করে না। যথাসম্ভব নিজেকে স্বাভাবিক দেখাবার চেষ্টা করে।

খাদ্য গ্রহণ না করবার ওজুহাত দেখিয়ে সে বলে, আসবার সময় মাকুদের ওখান থেকে খেয়ে আসছি। এক পেট ভরে খাইয়ে দিলো, আলু সেদ্ধ, পোড়া মাছ আর কেনে। জালা ভর্তি করে খেয়েছি। বিশ্বাস না হয়, টিপে দেখো। এক দানা খাবার যাবার আর জায়গা নেই। ফেটে পড়ছে।

পরিচিত লোক দেখে জুমা বিসিবিংগুই-এর কাছে আসে, জিভ দিয়ে পা চাটে। বিসিবিংগুই আদর করে তার গায়ে হাত বুলোয়। আনন্দে ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে দিতে হর্ষধ্বনি করে

ওঠে। ছুটে এসে খেলা-ছলে বিসিবিংগুই-এর আঙুল কামড়ে ধরে, আবার ছুটে গিয়ে ধূলোয় গড়াগড়ি দেয়। ভেতরকার খবর সে কিছুই জানে না। বাইরে যেটুকু চোখে দেখে, সেইটুকুই তার সব।

কিন্তু, হাজার হোক্, আর দশটা কুকুরের মত, জুমা একটা কুকুর ছাড়া আর কিছু তো নয়! অর্থাৎ, তাকে নিয়ে মেতে থাকবার কিছু নেই। কিছুক্ষণ পরেই বিরক্ত হয়ে ওঠে বিসিবিংগুই, কুকুরের খেলায় মন দেবার মতন মনের অবস্থা তার নয়। লাথি মেরে জুমাকে তাড়িয়ে দেয়। দূরে দাঁড়িয়ে জুমা ভাবে, হঠাৎ এ আবার কি হলো?

ইতিমধ্যে বাতোয়ালা গ্লাসের পর গ্লাস পান করে নেশায় টইটম্বুর হয়ে উঠেছে। আপনার খেয়ালে নাচতে আরম্ভ করে দেয়। কয়েক পা নাচে আবার পান করে। আবার কয়েক পা নাচে। পূর্ণিমা-রাতের প্রণয়-নাচের ছন্দ।

বাতোয়ালার ধারণা, সে নাচছে, ঠিক মতই নাচছে। কিন্তু আসলে সে শুধু দাঁড়িয়ে টলতে থাকে, এ-দিকে ও-দিকে বিবশের মত শুধু অঙ্গ দোলায়। সমস্ত দেহ যেন সীসের মতন ভারি; জমাট হয়ে গিয়েছে মস্তিষ্ক; পা দুটো যেন দেহের ভার বইতে পারে না; চোখ ফেটে যেন রক্ত পড়বে এখুনি। হঠাৎ নাচতে নাচতে একটা কাঠে ঠোক্কর লেগে পড়ে যায়। সটান মাটিতে শুয়ে পড়ে।

জুম্মা দূর থেকে মনিবের নাচ দেখছিল। হঠাৎ মনিবকে ধরাশায়ী হয়ে যেতে দেখে, ছুটে তার কাছে চলে আসে। মনিবের অবশ দেহকে বেষ্টন করে ঘুরতে থাকে আর চীৎকার করে। তার ধারণা, তার মনিব তার সঙ্গে খেলা করছে। তার চীৎকারে হয়ত এখুনি আবার উঠে দাঁড়াবে।

সত্যিই বাতোয়ালা উঠে দাঁড়ায়। জড়িতকণ্ঠে বলে, বহু ·· বহুকাল আগে একবার ঠিক এইরকম অবস্থায় পড়েছিল ইলিঙ্গো···

আপনার খেয়ালে অট্টহাস্য করে ওঠে। আবার বলতে আরম্ভ করে, ইলিঙ্গোকে চিনতে পারলে না, না ? আচ্ছা দাঁড়াও, তার সম্বন্ধে সব কথা আমি বলছি। তুমি জান না তো ? তবে শোন।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন, পৃথিবীতে আজকের মতন এত সব ঘর বাড়ী, দেশদেশান্তর কিছুই ছিল না···অনেকদিন আগে···শুধু ছিল মানুষ, অনেকদিন আগেকার মানুষ। কিন্তু একটা ছিল অসুবিধা, ভীষণ অসুবিধা। তখন ছিল ভয়ানক ঠাণ্ডা। সেই ঠাণ্ডার জন্যেই মানুষের মনে বড় অশান্তি ছিল। সে রকম ঠাণ্ডা না থাকলে, মানুষের আর কোন অসুবিধাই ছিল না। ঠাণ্ডায় হাত-পা অবশ হয়ে যেতো। প্রাণভয়ে মানুষ ঘুমোতে পর্যন্ত পারতো না। এই নিয়ে মানুষ রাতদিন ওজর-আপত্তি করতে সুরু করে দিলো। সেই ওজর শুনতে শুনতে,

আকাশে ছিল আইপু-চাঁদ, মানুষকে আশ্বাস দিলো, এই অশান্তির হাত থেকে সে মানুষকে বাঁচাবে। আইপু তার জন্যে ইলিঙ্গোকে ডেকে পাঠালো, এই ইলিঙ্গোরই আর একটা নাম হচ্ছে সেলাফু। ইলিঙ্গোর ওপর ভার দিলো, পৃথিবীতে গিয়ে মানুষকে আগুন ব্যবহার করতে শেখাতে। সেই কাজের ভার নিয়ে ইলিঙ্গো এলো পৃথিবীতে···দীর্ঘ তার কাহিনী···

বাতোয়ালা বলতে সুরু করে সেই পুরাণ-কাহিনী···

বাতোয়ালা বলতে আরম্ভ করে সেই পুরাণ কাহিনী, কি করে ইলিঙ্গো পৃথিবীতে নিয়ে এলো আগুন, মানুষকে শেখালো আগুনের ব্যবহার।

আইপু মনস্থ করলো, পৃথিবীর মানুষের সেই হিম-যন্ত্রণা দূর করবার জন্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইলিঙ্গোকে সেখানে পাঠাবেন। তার জন্যে তিনি একটা লম্বা দড়ি ইলিঙ্গোর কোমরে বেঁধে পৃথিবীতে নামিয়ে দিলেন। দড়ির সঙ্গে একটা লিংঘা বেঁধে দিলেন। কাজ শেষ হয়ে গেলে যখন ইলিঙ্গো ফিরে আসতে চাইবে, তখন সেই লিংঘায় আওয়াজ করলেই আইপু জানতে পারবে। তখন আবার দড়ি ধরে তাকে ওপরে টেনে নেবে।

ইলিঙ্গো পৃথিবীতে এসে মানুষকে শেখালো কি করে আগুন ব্যবহার করতে হয়। মানুষ ক্রমশ জানতে পারলো যে, আগুনের আঁচে শুধু যে হিমই দূর হয় তা নয়, আগুনের আঁচে তাদের

হাত-পা সুস্থ সবল হয়, আগুনের আঁচে তারা রান্না তৈরী করতে পারে, ঘরের অন্ধকার দূর করতে পারে।

এইভাবে ইলিঙ্গোর কাছ থেকে আগুনের ব্যবহার শিখতে শিখতে, পৃথিবীর মানুষ ইলিঙ্গোর প্রেমে পড়ে গেলো। তারা বুঝলো, তার মতন বন্ধু তাদের আর কেউ নেই। যা কিছু তারা বুঝতে পারে না, যা কিছু তাদের কাছে রহস্যময় জটিল বোধ হয়, ইলিঙ্গোকে জিজ্ঞাসা করে! ইলিঙ্গো তার জবাব দেয়।

একটা জিনিস পৃথিবীর মানুষকে সব চেয়ে ভাবিয়ে তুলেছিল। তারা প্রায়ই দেখতো, তাদের আশে-পাশে যে সব জন্তু ঘুরতো ফিরতো, হঠাৎ একদিন তারা অবশ হয়ে শুয়ে পড়তো, আর উঠতো না। ক্রমশ তাদের সামনে থেকে তারা একেবারে অদৃশ্য হয়ে যেতো। কোথায় যায় এই সব জন্তু অদৃশ্য হয়ে? কেন যায়? এ প্রশ্নের কোন উত্তরই তারা খুঁজে পায়না। তার জন্যে একটা অনিশ্চিত ভয় তাদের দেহের ভেতর তাদের স্নায়ুর সঙ্গে তাদের পাক-যন্ত্রের সঙ্গে যেন জড়িয়ে যায়। সেই যে জন্তুটা ঘুরছিল ফিরছিল ডাকছিল, সে কেন হঠাৎ এই রকম চুপ হয়ে গেলো? তখন তাদের যতই ডাকো, তারা আর সাড়া দেয় না। তখন তাদের যতই আদর করো, তারা আর নড়ে না, চড়ে না। যতই কেন তাদের খোসামোদ করো, তারা আর কোন উচ্চবাচ্য করে না। পড়ে থাকে অনড় অচল, শব্দহীন, স্থির। মাছিরা এসে তাদের নাকের ফাঁকের ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়ে। কোন

প্রতিবাদ করে না। তারপর দেখতে দেখতে একদিন গন্ধে পচে যায়। পোকা-মাকড় আর মাছি কিলবিল করে সেই পচা-দেহের ওপর। কেন এমন হয়? কোন উত্তর না পেয়ে একটা আতঙ্ক তাদের পেয়ে বসে। তারা সকলে মিলে ইলিঙ্গোকে চেপে ধরে, এ রহস্যের সমাধান তাকে করে দিতেই হবে। সে অনেক বিষয় জানে। নিশ্চয় এ বিষয়ও তার জানা আছে। উত্তর দিয়ে মানুষের এই আতঙ্ক তাকে দূর করতেই হবে। কিন্তু ভীত সন্ত্রস্ত মানুষদের এই প্রশ্নের কি উত্তর দেবে তা ইলিঙ্গো ঠিক করে উঠতে পারে না। বলে, আমার রাণী আইপুকে জিজ্ঞাসা করে এসে তোমাদের বলবো।

এই স্থির করে ইলিঙ্গো আবার আইপুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়। বলে, একটা ব্যাপার নিয়ে বড়ই মুশকিলে পড়েছি। পৃথিবীর মানুষরা একটা সমস্যা নিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছে। তারা মৃত্যুকে ভয় করে। তারা জানতে চায়, পশু-পাখীরা যেমন মৃত্যুর অধীন, মানুষও কি তেমনি মৃত্যুর অধীন?

আইপু বলে, তুমি ফিরে গিয়ে পৃথিবীর মানুষদের জানাও, এতে ভীত হবার কিছু নেই। আমি আমার দেহ থেকেই তাদের তৈরী করেছি। আমিও মৃত্যুর অধীন। তবে আমি আবার জন্মগ্রহণ করি। প্রত্যেক মৃত্যুর আট রাত্রির পর আমি আবার জন্মগ্রহণ করি। তাই মৃত্যুতে আমি অদৃশ্য হয়ে যাই বটে; তবে আবার নবজন্ম নিয়ে ফিরে আসি। মানুষদের জানিয়ে দিও,

আমার এই কথা। তারা যেন ভোলে না এই কথা। যাতে তারা আমার এই কথায় বিশ্বাস অর্জন করতে পারে, তার জন্যে আজ থেকে তোমাকে মানুষদের মধ্যে গিয়েই বাস করতে হবে।

সেই কথা বলে আইপু আবার সেই লিংঘা-শুদ্ধ দড়ি ঝুলিয়ে দিয়ে ইলিঙ্গোকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়।

ছ'হাত দিয়ে দড়িটা বেশ শক্ত করে ইলিঙ্গো ধরে থাকে। নামবার সময় নানান রকমের চিন্তায় তার মন এমন ভরে থাকে যে, এক সময় তার ধারণা হয় যে সে মাটিতে পৌঁছে গিয়েছে। সেইজন্যে অন্যমনস্কভাবে দড়ি ছেড়ে দেয়। তৎক্ষণাৎ সে শূন্য থেকে সজোরে এসে মাটিতে পড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলো। সেইদিন থেকে পৃথিবীতে অন্য সব জীব-জন্তুর মতন মানুষও মরতে লাগলো। সেইদিন থেকে যে মানুষ জন্মায়, সে মানুষই আবার মরে যায়। মৃত্যুর হাত থেকে কারুরই রেহাই নেই।"

বিসিবিংগুই একমনে বাতোয়ালার কথা শোনে। এই গল্প কেন আজ বাতোয়ালা তাকে শোনালো? সে কি এই গল্পের ভেতর দিয়ে তার আসন্ন মৃত্যুর কথাই ইঙ্গিত করছে? মনে তার ঘোরতর সন্দেহ জেগে ওঠে। হয়ত কয়েক মুহূর্ত পরেই তার জীবন শেষ হয়ে যাবে। হয়ত বাতোয়ালা তার সব আয়োজনই করে রেখেছে।

কিন্তু বিসিবিংগুই-এর মনে আর এক পুরাণ কাহিনী জেগে ওঠে। আর এক জাতের পুরাণ কাহিনী। বাতোয়ালাকে

প্রতিবাদ করে সে বলে, তুমি বল্লে, আইপুর আদেশেই ইলিঙ্গো এসেছিল পৃথিবীর মানুষকে আগুনের ব্যবহার শেখাতে? কিন্তু নিয়োন্‌বাঙ্গুই নদীর ধারে যে-সব জাতের লোক বাস করে তারা অন্য কথা বলে। তারা বলে, এই তোমার কুকুর, তোমার জুমার পূর্বপুরুষরাই নাকি পৃথিবীতে প্রথম আগুন নিয়ে এসেছিল।

শোন তাহলে, আমি বলছি সে-কাহিনী। বহু···বহুদিন আগেকার কথা। পৃথিবীতে প্রথম যে কুকুর জন্মেছিল, সে একদিন খেলা করছিল, পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল। খেলার ছলে, এইভাবে সে রীতিমত একটা গর্ত খুঁড়ে ফেলেছিল। হঠাৎ কিছুক্ষণ পরে খুঁড়তে খুঁড়তে সে যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলো। একটা পা তার জখম হয়ে গেল। সেই পাটা উঁচু করে সে যন্ত্রণায় লাফাতে লাগলো। সেই অবস্থায় তার মনিবের সামনে গিয়ে সে চীৎকার করতে লাগলো এবং মনিবকে টেনে সেই গর্তের কাছে নিয়ে এলো। গর্তের কাছে এসে মনিব দেখে, গর্তের ভেতরে কি যেন জ্বলছে! হাত দিয়ে দেখতে গিয়ে, তার হাতটাও পুড়ে গেলো। সেই মানুষ সর্বপ্রথম আগুনের সন্ধান পেলো।"

বিসিবিংগুই বলে, ওদের দেশে নদীতে যে সব বুড়ো মাঝি চলা-ফেরা করে, তাদের কাছে এই গল্প সে শুনেছে!

বাতোয়ালা সে-কাহিনীকে স্বীকার করতে পারলো না। বলে, তুমি নিয়োন্‌বাঙ্গুই নদীর ধারে যে জাতের লোকদের কথা

বলছো, তাদের আমি বেশ ভাল করেই চিনি···তারা হলো মিথ্যাবাদী। তাদের পুরাণ হলো মিথ্যার ঝুড়ি! অবিশ্বাস্য।

স্বরু হয়ে যায়, দুজনার তুমুল তর্ক।

বাতোয়ালা আর বিসিবিংগুই, দুজনেই অন্তরের আসল কথা চাপা দিয়ে, জাতির পুরাণের গল্প নিয়ে বচসা করতে স্বরু করে দেয়। বাতোয়ালা দেখাতে চায়, যেহেতু সে সর্দার, সেহেতু জাতির পুরাণ ব্যাখ্যা করবার অধিকার তারই বেশী এবং তার পিতার কাছ থেকে বংশ-পরম্পরায় সে এইসব জ্ঞান অর্জন করেছে। এইসব জ্ঞান বাইরে থেকে পাবার কোন উপায় নেই। প্রত্যেক বংশের কর্তার কাছে এই জ্ঞান থাকে। তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী তার জমি-জমার সঙ্গে সঙ্গে এইসব জ্ঞানেরও উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে। সেইজন্যে তাদের মধ্যে বংশ মর্যাদার এতখানি মূল্য।

বিসিবিংগুই জানে সে আজ এসে পড়েছে বাতোয়ালার ফাঁদের মধ্যে। তাকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেবার যে বাসনা বাতোয়ালার মনে জেগেছে, বাইরে তার কোন লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে না উঠলেও, বিসিবিংগুই জানে, সে-প্রতিশোধের-বহ্নি বাতোয়ালার অন্তরে তেমনি জ্বলছে। তাদের মনে একবার যে জিঘাংসা জাগে, রক্ত না দেখার আগে তা আর প্রশমিত হয় না! বাতোয়ালার কাহিনী সে অন্যমনস্কভাবে শুনে চলে কিন্তু তার মনের ভেতর একটি কথাই শুধু বড় হয়ে থাকে, আজ রাত্রির

শেষে প্রভাত-সূর্যকে কে দেখবে ? সে, না বাতোয়ালা ?

বিসিবিংগুই-এর কাহিনীর প্রতিবাদ করে বাতোয়ালা বলেঃ তুমি যে ইয়াকোমাদের কথা বলছো, তারা একটা নিরেট মূর্খ জাত ··তারা এইসব পুরাণ কাহিনীর কিছুই জানে না। আমার কাছ থেকে তুমি তার সত্য বিবরণ শুনতে পাবে। আমি এই-মাত্র যে ইলিঙ্গোর কাহিনী বল্লাম, জেনে রেখো সেই কাহিনীই হলো সত্য। পৃথিবীতে আজ মানুষ যে আগুন ব্যবহার করছে, তা একমাত্র ইলিঙ্গোর জন্যেই সম্ভব হয়েছে। তা ছাড়া, একথা বোধহয় তুমি জান না যে, এই যে আমাদের সব গ্রাম, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত সে-সবই সেই ইলিঙ্গোর কীর্তি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বাতোয়ালা বলে ওঠে, বিসি-বিংগুই, যতটুকু তোমার জানা দরকার, তার বেশী জানতে চেষ্টা করো না। আর একথা মনে রেখো, তুমি যতটুকু জান, আমি তার চেয়ে ঢের বেশী জানি···সেই সঙ্গে একথাও তোমাকে জানানো আমার দরকার, যতটুকু জানলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না, তুমি তার চেয়ে অনেক বেশী জেনে ফেলেছ···সেটা ভাল নয়।

বিসিবিংগুই চমকে ওঠে। এ কথাগুলোর মধ্যে সে যেন স্পষ্ট একটা আঘাতের সম্ভাবনার সুর শুনতে পায়। চারদিকে চেয়ে দেখে, সে একা। এ অবস্থায় বাতোয়ালাকে প্রতিবাদ করা তার পক্ষে উচিত হবে না। তাদের জাতের পুরাণ কাহিনী

বাতোয়ালা একাই কি সব জানে? বাতোয়ালার ভুল ধারণা। দম্ভ! বাতোয়ালার চেয়ে ঢের বেশী কাহিনী সে জানে। কিন্তু এখন সেকথা উত্থাপন করা ঠিক হবে না। হয়ত এই পথ ধরেই বাতোয়ালা তার সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে চায়। আজ, এই নির্জন নিশুতি রাতে, সে একলা···কিছুতেই আজ সে বাতোয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করবে না···কাল, শিকারের সময়···

হঠাৎ জুমা চীৎকার করে উঠলো···যেন অন্ধকারে কি দেখতে পেয়েছে! ছুটে খানিকটা দূর এগিয়ে যায়, আবার চীৎকার করতে করতে ফিরে আসে। বিসিবিংগুই চেয়ে দেখে, অন্ধকারের ভেতর থেকে একদল লোক আসছে। পথিক··· হয়ত পথ ভুলে গিয়েছে···তাদেরই স্বজাত···

হঠাৎ অন্ধকারের গহ্বর থেকে সেই লোকগুলোকে আসতে দেখে, বিসিবিংগুই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। এমন করে মানুষের সঙ্গ সে আর কোনদিন কামনা করে নি।

তাড়াতাড়ি উঠে লোকগুলোকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসে। নতুন করে একটা আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে তার চারপাশে গোল হয়ে তারা বসে।

আগুনের আঁচে বিসিবিংগুই লক্ষ্য করে বাতোয়ালার চোখ দুটো যেন বাঘের চোখের মতন জ্বলছে। জ্বলুক···আজ আর তার ভয় নেই! আজকের রাত সে বেঁচে থাকবে···তারপর কাল দেখা যাবে; পৃথিবীতে কে বেঁচে থাকে, বাতোয়ালা না সে!

বাতোয়ালা আবার গল্প বলতে আরম্ভ করে। আকাশের গায়ে তখন অসংখ্য তারা ফুটে উঠেছে। সেইদিকে চেয়ে বাতোয়ালা বলে, এই যে আমার মাথার ওপরে রূপোর টাকার মতন অসংখ্য "আম্‌বি রেপি" জ্বলছে···মনে হচ্ছে যেন অসংখ্য চোখ পিট্ পিট্ করছে, ওগুলো আসলে কি, তা জানো? ওগুলো আসলে হচ্ছে, আকাশের গায়ে অসংখ্য ছেঁদা, সেই সব ছেঁদা দিয়ে বৃষ্টির দিনে পৃথিবীতে বৃষ্টি পড়ে!

প্রতিবাদ করতে গিয়ে বিসিবিংগুই আবার থেমে যায়। বাতোয়ালা নিজের জ্ঞান জাহির করবার জন্যে বলতে আরম্ভ করে, আমাদের পূর্ব-পুরুষরা জানতেন কি করে বৃষ্টিকে ডেকে আনতে পারা যায়। বিশেষ করে চাষ-বাসের মাসে, যে বছরে বৃষ্টি হতো না সে বছরে তাঁরা মন্তর পড়ে আকাশ থেকে বৃষ্টি টেনে আনতেন। মাঠের ওপর একটা মাটির সরায় মুঠো মুঠো নুন রেখে তারা আম্‌বি রেপিদের মন্তর পড়ে নেমন্তন্ন করতো। সেই মন্তর-পড়া নুনের লোভে দেখতে দেখতে আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরে পড়তো। আজকাল আমরা সে-সব মন্ত্র ভুলে গিয়েছি। এই সব নোংরা শাদালোকগুলোর সংস্পর্শে এসে আমরা আমাদের পুরানো সব বিদ্যা ভুলে যাচ্ছি। এই বিসিবিংগুই-এর মতন যারা আজকালকার ছোকরা, তারা নিজেদের জাতের ধর্ম-কর্ম ভুলে শাদা লোকদের অনুকরণ করতে ছুটছে···সমস্ত জাতটাকে মেরে ফেলছে...

বিসিবিংগুই হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। মাটিতে শোয়ান বর্শাটার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে, তার চারদিকে লোক। এত লোককে সাক্ষী রেখে, কোন কিছু করা ঠিক নয়। সে নিজেকে আবার সংযত করে নেয়। রাতটা শেষ হোক্ !

নবম পরিচ্ছেদ

বনের ভেতর, দুধারে ঘন-ঝোপ, তার মধ্যে দিয়ে সরু পথ। ঠাণ্ডা, শিশির ভেজা। চারদিক থেকে উঠছে একটা ভিজে মিষ্টি গন্ধ···বুনো লতার গন্ধ···পায়ের চাপে নরম কচি ঘাসের গন্ধ। পাতায় পাতায় শিহরণ জাগিয়ে দ্রুত বয়ে চলেছে বাতাস। বাইরে প্রান্তরে বিন্দু বিন্দু গলে পড়ছে কুষাশা···টুপ টাপ। উদয়-সূর্যের দিকে চেয়ে জেগে উঠছে ছোট ছোট গ্রামগুলি, জেগে উঠছে তাদের ঘিরে ঘুমিয়েছিল যে সব ছোট ছোট পাহাড়। প্রভাত এসেছে।

একটু একটু করে দেখা দেয় ধোঁয়া···আসে-যায় টুকরো টুকরো শব্দ···কে কাকে ডাকছে, বাতাসে আসে তার ছেঁড়া ছেঁড়া আওয়াজ···সে আওয়াজ বহন করে আনে জেগে-ওঠার সংবাদ ···প্রভাত !

বনেতে জেগে উঠেছে হরেক রকমের পশু···ঝোপের আড়ালে আড়ালে ঘুরছে খাদ্যের অন্বেষণে···ভক্ষিত হবার ভয়ে আবার কেউ কেউ ঢুকেছে যে-যার গর্তে···সেখানে অপেক্ষা করে

থাকবে রাত্রির অন্ধকারের জন্যে। মানুষের রাত্রি এলে, আসবে তাদের জেগে-ওঠার লগ্ন···তখন তারা আবার বেরুবে খাদ্যের অন্বেষণে। খাদ্য আর খাদক···অরণ্যে আছে শুধু এই একটি সম্পর্ক।

এমন দিনে কালো নিগ্রোর দল যে-যার অস্ত্র হাতে বেরিয়ে পড়ে অরণ্যে শিকারের খোঁজে। অরণ্যের মধ্যে তারা হয়ে যায় অরণ্যের সামিল। তারা জানে, শিকার খোঁজাই হলো শিকারের আনন্দ। যারা বীর, তাদের একমাত্র খেলা। বনের পশু আর গাঁয়ের মানুষের লড়াই···যার শক্তি বেশী সে থাকবে বেঁচে।

বিপদ ? প্রচুর আছে বিপদ। বিপদ আছে বলেই শিকারের এত দাম। যুদ্ধ করবার আগে তাই শিখতে হয় শিকার করতে ; যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে হলে, আগে হতে হবে শিকারী। এই অরণ্যে দুরন্ত বুনো পশুর সঙ্গে সামনাসামনি লড়াই-এ মানুষ শেখে আত্মরক্ষার হাজার রকম কায়দা, শেখে ধৈর্য, পায় সাহস, আঘাত দেবার আর আঘাত নেবার অভ্যাস।

বনের পথে ভিজে ঘাস মাড়িয়ে চলেছে বিসিবিংগুই আর বাতোয়ালা। শিকারে। তাদের মনের মধ্যে চলেছে তখন আর এক শিকারের তাগাদা। কে আজ কাকে করবে শিকার।

প্রতিহিংসা আগুন, যে-আগুন নেভে না কোন জলে। তাকে নেভাতে হলে, দরকার রক্তের। নইলে সে-আগুন তোমাকেই দেবে জ্বালিয়ে ছাই করে। মনের ভেতর সেই জ্বলন্ত

আগুনের শিখা নিয়ে তা আজ চলেছে শিকারে।

একজন চলেছে এগিয়ে, আর একজন চলেছে তার পেছনে। তার পেছনে চলেছে জুমা।

মাঝে মাঝে চলতে চলতে তাদের সঙ্গে দেখা হয় অন্য সব শিকারী-দলের। বাতোয়ালাকে দেখে, সর্দার বলে তারা অভিবাদন জানায়। অপেক্ষা করে থাকবার সময় নেই। সামনে ঝোপে কোথায় ওঠে একটা ঘস্ ঘস্ শব্দ···কান খাড়া করে তারা সেই দিকে ছোটে। সবাই এগিয়ে চলেছে বনের বুকের দিকে, বন্য-পশুদের আড্ডার দিকে। সেখানে সকলে একত্র হয়ে ব্যবস্থা ঠিক করে নেয়। এক এক দলের ওপর, এক এক রকম কাজের ভার পড়ে। কেউ রাখে লক্ষ্য, কেউ মাটিতে খুঁজে বার করে বুনো জন্তুদের পায়ের দাগ, কারুর ওপর ভার পড়ে আগুন জ্বালাবার। খুব অল্প লোকই আসল শিকারে নিযুক্ত হয়···উদ্যত বর্শা হাতে বুনো বাঘকে তাড়া করে ছোটে।

দিন বেড়ে ওঠে। নানাদিক থেকে, নানা পথ বেয়ে তারা এসে জড় হয় নদীর ধারে। নদীর ওপারে আসল জঙ্গল। সেই জঙ্গলে সুরু হবে শিকারের খেলা।

তার আগে, তারা নদীর ধারে সকলে একত্র হয়ে বসে। শিকারের দিন হলো উৎসবের দিন। প্রত্যেকের সঙ্গে কিছু না কিছু খাদ্য থাকে। শিকারে ছোটবার আগে, তারা দেহকে সবল করে নেয়। সকলে মিলে গোল হয়ে খেতে বসে। খাবার সময়

হয় মজাদার সব গল্প। শিকারের গল্প। পূর্ব-অভিজ্ঞতার গল্প। বুনো জন্তুদের রীতি-নীতি, অভ্যাসের নানান রকম গল্প···

"লোকের ভুল ধারণা যে বামারা-রা সিংহ, দল বেঁধে শিকারের খোঁজে বেরোয়···"

"অবিশ্যি, সিংহ আর সিংহিনী স্বামী-স্ত্রীতে এক সঙ্গেই অনেক সময় শিকারের সন্ধানে বেরোয়। তবে সিংহিনী যখন বাচ্ছা প্রসব করে তখন আর সে শিকারে বেরোতে পারে না··· নিজের ঘরে তখন সে বাচ্ছাদের নিয়ে স্তন্যদান করে, স্বামীর ওপর ভার পড়ে সংসারের জন্যে মাংস শিকার করে নিয়ে আসবার।"

"তবে সিংহিনীও ছেলেপুলে নিয়ে খুব বেশীদিন আটক পড়ে থাকে না। যেই দেখলো বাচ্ছারা মজবুত হয়ে উঠেছে, তখনি স্বামী-স্ত্রী বাচ্ছাদের ডেকে নিয়ে সোজা বনের পথ দেখিয়ে দেয়। বাচ্ছারা তখন বাপ-মার কথা ভুলে বনের মধ্যে নিজেদের পথ নিজেরাই করে নিতে বেরিয়ে পড়ে। স্বামী-স্ত্রীতে পাশাপাশি একসঙ্গে আবার তারা তখন শিকার করতে বেরোয়।"

"কারুর কারুর ধারণা যে, শিকারের সময় সিংহ গর্জন করে। ভুল! সম্পূর্ণ ভুল ধারণা! আরে, একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, তুমি যখন বর্শা হাতে হরিণের পেছনে ছোট, তখন কি তত শব্দ করো? যত চুপি চুপি যেতে পার তত ভাল। তবে সিংহ কেন গর্জন করবে? সে কি এমন মূর্খ যে, আগে

থাকতে গর্জন করে, সমস্ত পশুদের আগে থাকতে সতর্ক করে দেবে? তা কি কখনো কেউ করে? তবে, হাঁ, সিংহ গর্জন করে, কখন? যখন তার আনন্দ হয়। যখন নিহত পশুর বুক চিরে সমস্ত থাবা রক্তরাঙা করে তোলে, তখন আনন্দে সিংহ গর্জন করে ওঠে!"

শিকার আরম্ভ হবার আগে নদীর ধারে সকলে একত্র জটলা করে বসে। খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে চলে গাল-গল্প। শিকারের গল্প।

ক্রমশ মাথার ওপরে সূর্য ঠিক মাঝ-আকাশে এসে পৌঁছায়। এমন সময় বনের চারদিক থেকে ওঠে গুর্ গুর্ গুম্ গুম্ আওয়াজ। বাজন্দার-রা সুরু করে তাদের কাজ। বাজনার শব্দে বনের পশুদের বিভ্রান্ত করে তোলা হলো তাদের কাজ।

কিছুক্ষণ পরেই নদীর ওপারে বনের ধার থেকে ওঠে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। সারা বনকে বেড়ে তারা শুকনো ঝোপে লাগিয়ে দেয় আগুন।

এমন সময় দূর থেকে ভেসে আসে বাতাসে অসংখ্য কণ্ঠে আওয়াজ, ইয়াহো!

ইয়াহো! শিকার আরম্ভের সঙ্কেত।

সেই শব্দ, সেই বাজনা, আর সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী জানিয়ে দেয়, শিকারের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত।

ইয়াহো! নদী পেরিয়ে বর্শা হাতে ছুটে চলে আসল

শিকারীর দল। রোদে ঝিক্‌মিক্ করে ওঠে কোমরের ছোরা।

ইয়াহো! তৈরী হয়েছে বন···হয়েছে সময়···এইবার শিকারের পেছনে যে-পারে সে ছুটবে···সমস্ত অরণ্য এখন মুক্ত শিকারীদের জন্যে···যার হাতের বর্শায় আছে জোর···শিকার তার।

দেখতে দেখতে সমস্ত বনকে ঘিরে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে ধোঁয়া···ধোঁয়ার রঙ একটু একটু করে হয়ে আসে ফিকে··· তারপর লক্ লক্ করে হাজার জিহ্বায় জ্বলে ওঠে দাবানল··· সমস্ত বনকে ঘিরে জ্বলে ওঠে অগ্নি-বলয়···সে-অগ্নির আতঙ্কে পশুরা বিবর ছেড়ে ছুটতে আরম্ভ করে···দগ্ধ হয়ে যায় সাপেরা ···ঝোপের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে পড়ে শাবকদের নিয়ে সিংহিনী···পুড়ে ছাই হয়ে যায় লতা-গুল্ম, তৃণ-কণ্টক।

এই আগুন না হলে হয় না শিকারের উৎসব। শিকারকে উপলক্ষ্য করে অরণ্যকে দগ্ধ করার মধ্যে শুধু যে পশুদের আতঙ্কিত করাই উদ্দেশ্য, তা নয়; এর সঙ্গে সংযুক্ত আদিম অরণ্যবাসীদের জীবন-যাত্রা-চক্র। এইভাবে অরণ্যকে দগ্ধ করে আগুন মাটিকে করে উর্বর, দগ্ধ লতা-গুল্মের ভস্মে মাটি পায় তার প্রয়োজনীয় আহার্য। শিকারের উৎসবের পরেই আসে জমি-চষার উৎসব। দগ্ধ মাটির ওপর চলে হলকর্ষণ। জন্মায় শস্য। এইভাবে শিকারের এই বার্ষিক উৎসবের সঙ্গে গাঁথা তাদের জীবন-যাত্রা-চক্র।

তাই আগুন হলো এই অরণ্যচারী মানুষদের বন্ধু। তাদের শিকারের সহায়, সঙ্গী। তাদের অন্নদাতা। অন্ধকার নিস্প্রদীপ ঘন তামসী রাত্রে তাদের ভয়ত্রাতা। শীতের কুহেলি-আচ্ছন্ন রাত্রে তাদের নগ্ন নিরাবরণ দেহের উত্তাপ-রক্ষক।

দশম পরিচ্ছেদ

দেখতে দেখতে অগ্নি-তাড়িত অরণ্যের চারদিক থেকে জেগে ওঠে আতঙ্কিত আর্তনাদ। বাতাস আর আগুনের শব্দের সঙ্গে মিশে যায় শিকারীর উন্মত্ত উল্লাসিত চীৎকার···তাকে ছাপিয়ে ওঠে মৃত্যু-ভীত পশুর অন্তিম আর্তনাদ। অরণ্যের প্রত্যেক তৃণ যেন শব্দ হয়ে ফেটে পড়ে। প্রলয়ের শব্দ।

আগুন ছুটে চলে···বাতাস তাকে ক্ষেপিয়ে তোলে···বর্শা হাতে শিকারের পেছনে ছুটে চলে শিকারী···চারদিকে সুরু হয় দিকভ্রান্ত ভীত পশুদের উল্লম্ফন···চারদিকে ছুটোছুটি···অরণ্যের পশুর সঙ্গে মানুষের আদিম হত্যা-পিপাসার সংগ্রাম···দয়াহীন, মায়াহীন, ক্ষমাহীন মৃত্যুর খেলা। শিকার এবং শিকারী, কেউ জানে না কে কাকে করবে শেষ। একটু অসতর্ক যদি হয়েছে শিকারী অমনি ক্রুদ্ধ সিংহের থাবায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে তার উদর ··শিকারীর হাতের লক্ষ্যের মধ্যে এলে মুক্তি নেই শিকারের। এক তিল সময় নেই ভাববার, দাঁড়াবার, অন্যমনস্ক হবার। হয় মারতে হবে, নয় মরতে হবে।

সহসা এক প্রান্ত থেকে উঠে বিকট উল্লাস, ইয়া হো…ইয়া…

বর্শার ফলকে লুটিয়ে পড়েছে প্রথম শিকার…মাটিতে, পড়েছে প্রথম ঝলক রক্ত! জমে ওঠে উৎসব। মাটিতে রক্ত, গাছের গায়ে রক্ত, ঝোপে রক্ত, পা ভিজে যায় আহত পশুর রক্তে। দীর্ণ পশুর বুক থেকে ফিন্‌কী দিয়ে গায়ে লাগে লোনা গরম রক্ত। ইয়া হো…ইয়া…রক্ত-মাখা মাটিতে শুরু হয় রক্তের নাচ…শিকার হলো রক্তের নাচের উৎসব! তীব্র সুরার মতন শিরায় উপশিরায় রক্ত জাগিয়ে তোলে উন্মাদ নেশা…হত্যা হয়ে যায় খেলা, মৃত্যু হয়ে যায় নাচের ছন্দ।

রক্ত আর শব্দের নেশায় হঠাৎ বিসিবিংগুই-এর মধ্যে জাগে, বহু যুগ আগেকার ভুলে-যাওয়া ঘটনার মত, বাতোয়ালার কথা। ইয়াসীগুইন্দজা…সে আর ইয়াসীগুইন্দজা…আর বাতোয়ালা!

হ্যাঁ, বাতোয়ালা! কাল রাত্রিতে সে বেড়িয়েছিল শিকারে…বাতোয়ালাকে হত্যা করবার জন্যে। সে জানে, কাল সারারাত বাতোয়ালাও মনে মনে তাকেই শিকার করে বেড়িয়েছে। কে থাকবে? সে আর ইয়াসীগুইন্দজা? না, বাতোয়ালা আর ইয়াসীগুইন্দজা?

এমন সময় ঠিক তার মাথার ওপর দিয়ে একলক্ষ মৌমাছির মতন শব্দ করতে করতে ছুটে চলে গেল একফালি একটা আলো…ঝক্‌ঝকে একটা বর্শা!

কে ছুঁড়লো এই বর্শা ?

নিমেষের মধ্যে বিসিবিংগুই-এর মনে ঝিলিক দিয়ে উঠলো সেই গুপ্তঘাতকের চেহারা···

পেছন ফিরে চেয়ে দেখতেই চোখে পড়লো, তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাতোয়ালা।

নিমেষের মধ্যে বিসিবিংগুই হাতে তুলে নিলো বর্শা···কিন্তু ছুঁড়তে যতটুকু সময় লাগে, তার মধ্যে দেখলো একটা হলদে আগুন লাফিয়ে পড়লো বাতোয়ালার ওপর······বাঘ !

বাতোয়ালা তাকে এড়াবার জন্যে তৎক্ষণাৎ মাটিতে সটান হয়ে শুয়ে পড়লো···

হলদে আগুনটা লাফাতে লাফাতে ঘন সবুজ ঝোপে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিন্তু বাতোয়ালা আর উঠলো না। বিসিবিংগুই এগিয়ে গিয়ে দেখে, সেই একটা লাফের মধ্যে বাঘ বাতোয়ালার পেট চিরে দিয়ে চলে গিয়েছে···

বিসিবিংগুই কোন কথা না বলে উল্‌টো পথ ধরে চলে গেল···

একাদশ পরিচ্ছেদ

বাতোয়ালাকে তারা তুলে নিয়ে এসেছে তার ঘরে। তার ঘরের সামনে একটা মস্ত বড় বাদাম গাছ···সেই গাছের তলায়

শুয়ে আছে বাতোয়ালা। শুয়ে আছে আজ সাতদিন। যন্ত্রণায় সেইখানে গড়াগড়ি দেয়, যন্ত্রণায় সেইখানেই অবশ হয়ে পড়ে থাকে। বাঘে যার পেটে নখের স্বাক্ষর দিয়ে গিয়েছে, সে বাঁচে না। বাতোয়ালাও বাঁচবে না। সুতরাং তাকে ঘিরে বসে থেকে সারা বছরের শিকারের কে করবে ক্ষতি? বাতোয়ালার কাছে গাছতলায় চব্বিশ ঘণ্টা আছে একজন মাত্র সঙ্গী···তার সেই হ্যাংলা কুকুর জুমা।

বাতোয়ালা তখনো চেয়ে আছে তার ঘরের দরজার দিকে··· সেই ঘরের ভেতর আছে ইয়াসীগুইন্দজা···ভয়ে ইয়াসীগুইন্দজা তার কাছে আসে নি···

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গভীর রাত্রি···যন্ত্রণায় বাতোয়ালার চোখ বুজে গিয়েছে··· সে স্পষ্ট দেখছে, সে চলেছে সেই সবুজ-ঝোপে-ঢাকা পথ দিয়ে না-চাইতে-সব-পাওয়ার দেশে।

এমন সময় কিসের যেন শব্দ হলো···তার শিকারী মন নিমেষে তাকে জাগিয়ে দিলো···শুকনো পাতার ওপর খস্ খস্ শব্দ···ওঠো, জাগো বাতোয়ালা শিকার এসেছে! বাতোয়ালা চোখ খুলে দেখে, চাঁদের আলোয় ইয়াসীগুইন্দজা বিসিবিংগুই-এর সঙ্গে চলেছে···

বাতোয়ালা গর্জন করে ওঠে···কিন্তু শুধু একটা ঘড়্ ঘড়্

আওয়াজ হয়···হাত ছুঁড়ে কি যেন খোঁজে···তারপর, বর্শার অভাবে নিজের মুমূর্ষু দেহকে বর্শার মতন করে নিজেই নিক্ষেপ করে।

এতদিন ধরে যে বন্য শক্তিকে সে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে সঞ্চয় করে রেখেছিল, দেহ-নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তা নিঃশেষিত হয়ে গেল।

অন্তিম মুহূর্তের অন্ধকারে শুধু কানে আসে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে দুটি মানুষের চলে-যাওয়ার শব্দ···

ঘুমাও বাতোয়ালা!

সমাপ্ত

মন্না ভান্না

মরিস্ মেতারলিঙ্ক

জগদ্‌বিখ্যাত বেল্‌জিয়ান্ নোবেল লরিয়েট মরিস্ মেতারলিঙ্কের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। এই পুস্তকের মূল বিষয় হলো, প্রেম। কালীদাসের মেঘদূতের মতন প্রেমের একটা অবিস্মরণীয় সাহিত্য-মূর্তি। এই অপরূপ গ্রন্থে মেতারলিঙ্ক প্রেমের যে মূর্তিকে ফুটিয়ে তুলেছেন, যে অপরূপা একটি নারী-চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার মতন সে নিজের মহিমায় ঘোষণা করে গেল, 'আমি আমার অপমান সহিতে পারি, প্রেমের সহে না অপমান।' জগতের প্রেম-সাহিত্যে মন্না ভান্না স্বকীয় মহিমায় এক স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছে।

পুষ্পময়ী বসু অনূদিত

দাম : তিন টাকা

বিশ্ব-সাহিত্য-গ্রন্থমালা

প্রথম গ্রন্থ—**কথা কও**

রচনা—ভেরকর্ (ছদ্মনাম)

অনুবাদক—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

মূল্য—১৷৷০

স্বল্প মূল্যের মধ্যে বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলিকে বাঙ্গালী পাঠক-সমাজের কাছে উপস্থিত করবার জন্যে আমরা এই অনুবাদ গ্রন্থমালার প্রবর্তন করেছি। নিয়মিতভাবে এ গ্রন্থমালায় বিশ্ব-সাহিত্য থেকে চয়ন করে অমূল্য সব কাহিনী বাংলা ভাষায় অনূদিত করা হবে। এই গ্রন্থমালার প্রথম বইখানি জার্মান অধিকারের সময় ফ্রান্সে সংগোপনে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বীর ফরাসী রমনীরা মাটীর তলায় লুকিয়ে এই বইখানির মুদ্রন কার্য্যে সহায়তা করেন। এই বইখানি সাধারণ যুদ্ধ-সাহিত্য নয়। এই গ্রন্থে যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তা বিশ্ব-সাহিত্যের অমর সম্পদ হয়ে থাকবে এবং এর ভেতরে বিজয়-গর্বী জার্মানী ও বিজিত ফ্রান্সের অন্তরাত্মার পরিচয় নিহিত আছে।

——